আর টি ই-র উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসার, স্কুল বন্ধ করা নয়।
— পৃঃ ১৪

দাম : দশ টাকা

# স্বস্তিকা

সুকমায় অ্যাম্বুশের পর মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে নতুন ব্যবস্থা
—পৃঃ ১৯

৬৯ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ২২ মে ২০১৭।। ৭ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

## মাওবাদী সন্ত্রাস কত রক্ত ঝরবে

**১ ডিসেম্বর ২০১৬**
জয়শঙ্কর ভূপালপল্লী, তেলেঙ্গানা
১ জন গুরুতর আহত

**৩ ডিসেম্বর ২০১৬**
সুকমা, ছত্তিসগড়
১ জন গুরুতর আহত

**৬ ডিসেম্বর ২০১৬**
দান্তেওয়াড়া, ছত্তিসগড়
মৃত ১, আহত ১

**২৭ ডিসেম্বর ২০১৬**
বিজাপুর, ছত্তিসগড়
মৃত ১

**১৩ জানুয়ারি ২০১৭**
নারায়ণপুর, ছত্তিসগড়
মৃত ৫

**১৮ জানুয়ারি ২০১৭**
নারায়ণপুর, ছত্তিসগড়
মৃত ৩, আহত ৪

**১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭**
কোরাপুট, ওড়িশা
মৃত ৮, আহত ৫

**১১ মার্চ ২০১৭**
সুকমা, ছত্তিসগড়
মৃত ১২, আহত ২

**১৮ মার্চ ২০১৭**
দান্তেওয়াড়া, ছত্তিসগড়
মৃত ৮, আহত ৩

**২৪ মার্চ ২০১৭**
পালামৌ, ঝাড়খণ্ড
মৃত ৩

**২৪ এপ্রিল ২০১৭**
সুকমা, ছত্তিসগড়
মৃত ২৬, আহত ৬

# স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২২ মে - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।




# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** □ ৫

**সংবাদ প্রতিবেদন** □ ৬-৯

**সাবধান, মোদী হটাতে চোরেদের মহাজোট গড়ছেন দিদি** □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

**খোলা চিঠি : দিদির গলায় কাঁটা ফুটিয়াছে** □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

**সংবিধানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটি অস্পষ্ট, জটিল ও বিভ্রান্তিকর** □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১২

**আর টি ই-র উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসার, স্কুল বন্ধ করা নয়** □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ১৪

**সি বি আই নয়, সচেতন গণ-আন্দোলনই পারে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের জন-বিচ্ছিন্ন করতে** □ কে এন মণ্ডল □ ১৬

**সুকমায় অ্যাম্বুশের পর মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে নতুন ব্যবস্থা** □ মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃপ্রাঃ) □ ১৯

**কিশোরবাহিনী গড়তে শিশু অপহরণ মাওবাদীদের** □ চন্দ্রভানু ঘোষাল □ ২১

**রক্তমাখা রাজনীতির প্রতিরোধের সময় এসেছে** □ অভিমন্যু গুহ □ ২২

**মোদীর জনপ্রিয়তাই আজ যে কোনো নির্বাচনের নির্ণায়ক শক্তি** □ আরতি জিরাত □ ২৭

**মানব ইতিহাসের প্রথম সাংবাদিক নারদ** □ রাকেশ দাশ □ ৩১

**গণিত-কিংবদন্তী রামানুজন** □ রূপশ্রী দত্ত □ ৩৩


## নিয়মিত বিভাগ


**এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬** □ **চিঠিপত্র : ২৮-২৯** □ **অঙ্গনা : ৩৪** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** □ **অন্যরকম : ৩৬** □ **রঙ্গম : ৩৭** □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১**□ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

# স্বস্তিকা

### আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## কামতাপুরীর দাবি ও ভাষা

গত বেশ কয়েক বছর ধরে ‘কামতাপুরী’ শব্দটি সংবাদমাধ্যমে মাঝেমধ্যেই আলোচিত বিষয় হয়ে উঠছে। কামতাপুরী নামে রাজ্য গঠনের ডাক, তা নিয়ে আন্দোলন— এমনই নানা ধরনের সব বিষয়। ভাষাও এক্ষেত্রে একটি বড় উপাদান। আগামী সংখ্যায় এই প্রেক্ষাপটেই উত্তরবঙ্গের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন ড. সুখবিলাস বর্মা।

দাম একই থাকছে ১০ টাকা মাত্র


বেঙ্গল
সামুই
ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই*

*ব্যবহার করুন*

*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## কুলভূষণ : পাকিস্তানকে মুখের মতো জবাব

ভারতীয় চর সন্দেহে পাকিস্তানে ধৃত ও সেই দেশের সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ভারতীয় প্রাক্তন নৌ-সেনা অফিসার কুলভূষণ যাদবের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য নেদারল্যান্ডসের হেগ-এ স্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আইনি যুদ্ধে নামিয়াছে। ভারতের আশঙ্কা আদালতে শুনানি শেষ হইবার আগে ও রায় ঘোষণার আগেই কুলভূষণকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। স্বাভাবিক ভাবেই উঠিয়া আসিয়াছে ভিয়েনা কনভেনশনের প্রসঙ্গ। সেই কনভেনশনের ভিত্তিতেই কুলভূষণকে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করিবার অধিকার ও নিজের পছন্দমতো আইনজীবী নিয়োগের অধিকার দিতে পাকিস্তান বাধ্য বলিয়া ভারত সওয়াল করিয়াছে। কুলভূষণের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকরা ১৬ বার দেখা করিতে চাহিবার আবেদন করিলেও পাকিস্তান তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। ইহা আন্তর্জাতিক চুক্তির (ভিয়েনা কনভেনশন) ঘোরতর অবমাননা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে ভারত। পাশাপাশি বলা হইয়াছে যে কুলভূষণের অপরাধ এবং তাঁহার বিচার-সংক্রান্ত কোনো নথিই ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। কেবলমাত্র তাঁহার জবানবন্দির ভিত্তিতেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পাক-কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হইয়াছে। বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, আমেরিকার মামলার প্রসঙ্গ তুলিয়া ধরিয়া ভারতের পক্ষে আইনজীবী হরিশ সালভের দাবি, যাদবের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ নাই। বরং পাকিস্তানের ভিয়েনা কনভেনশন ভঙ্গের প্রমাণ স্পষ্ট। কাহাকেও তাঁহার জীবনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না আইসিসিপিআরের ৬ ধারা অনুযায়ী। ভারত তাই আশ্বস্ত বোধ করিতেছে, পাকিস্তান কুলভূষণকে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছে, তাহা ভুল বলিয়া আন্তর্জাতিক আদালত রায় ঘোষণা করিবেন।

কিন্তু আশঙ্কা হইল, আদালত ভারতের পক্ষে রায় ঘোষণা করিলেও পাকিস্তান তাহা অস্বীকার করিতে পারে। তবে ইহাও ঠিক, রায় বিপক্ষে যাইলে পাকিস্তানের সমস্যা বাড়িবে। সেনাবাহিনীর পক্ষে অস্বস্তিকর এমন কিছু উপেক্ষা করা পাকিস্তানের পক্ষে সহজ হইবে না। আর ইহার ফলে এই ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে যে নওয়াজ শরিফ সরকারকে মুশকিলে ফেলিবার জন্য কুলভূষণকে ভারতের চর হিসাবে প্রচার করা হইয়াছিল। ভারত-পাক সম্পর্ক স্বাভাবিক করিবার প্রক্রিয়া যাহাতে আর অগ্রসর হইতে না পারে এইজন্য কুলভূষণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। ভারতের পক্ষে সমস্যা হইল, পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে পারিলেও সেনাবাহিনীর উপর তাহা সম্ভব নয়। তাই এমন কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন যাহার প্রভাব পাকিস্তান সেনার উপর পড়িবে। কুলভূষণের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ভারতের অন্য কোনো উপায়েরও সন্ধান করিতে হইতে পারে। আদালতের রায় যাহাই হউক, এই বিষয়ে ভারতের ঐক্যবদ্ধ রূপ প্রদর্শন খুবই জরুরি। কুলভূষণ যাদবের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়টি কংগ্রেস-সহ কয়েকটি দল বাঁকা চোখে দেখিয়াছে। বোধহয়, বিরোধিতার জন্যই তাহারা বিরোধিতা করিতেছে। কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ড মকুব হইলে ভারতের পক্ষে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করা সহজ হইবে যে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনের কোনো ধার ধারে না। আদালতের নির্দেশ অস্বীকার করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার সমস্যা বাড়িবে। পাকিস্তান যে ইতিপূর্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের কয়েকটি নিয়ম-কানুন উল্লঙ্ঘন করিয়াছে সেই বিষয়টিও বিশ্ববাসীকে জানাইবার জন্য ভারতকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

## সুভাষিতম্

*শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ।*
*বক্তা দশসহস্রেষু দাতা ভবতি বা ন বা।।*

*শত ব্যক্তির মধ্যে একজন শূর-বীর হন, হাজার ব্যক্তির মধ্যে একজন বিদ্বান হন, দশ হাজার ব্যক্তির মধ্যে একজন বক্তা হন এবং লক্ষ লোকের মধ্যে দাতা বিরলই হয়।*

# মালদার বামনগোলায় ধর্মান্তরণের চক্রান্ত পাদরির

**তরুণ কুমার পণ্ডিত**॥ মালদহ জেলার বনবাসী-অধ্যুষিত হবিবপুর, গাজল, পুরাতন মালদহ ও বামনগোলা ব্লকগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে বনবাসী সাঁওতালদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরণের কাজ পরিকল্পনা মাফিক হয়ে চলছে। গত ৯, ১০ ও ১১ মে বামনগোলার জামুগাড়িয়া গ্রামে প্রার্থনা সভার আড়ালে এই রকম এক ধর্মান্তরণের চক্রান্ত প্রকাশ্যে চলে আসায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঝাড়খণ্ড থেকে আসা পাদরি নাজির নাথানির মুর্মু তিন দিন ধরে প্রার্থনার মাধ্যমে

ক্যানসার-সহ বহু কঠিন অসুখ ভাল করার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাকার কয়েকশো সাঁওতাল মহিলা ও পুরুষকে ধর্মান্তরিত করে। স্থানীয় সাঁওতাল সমাজ এর বিরোধিতা করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। বাইবেল ও অন্য পুস্তক বিতরণ করা ও প্রকাশ্যে প্রলোভন দেখিয়ে মানুষদের আকৃষ্ট করতে যিশুর মূর্তি তৈরি করে জনসভায় বক্তব্য রাখা চক্রান্তের বড়সড় দৃষ্টান্ত বলে মনে করছেন গ্রামবাসীরা। তাদের বক্তব্য, পুলিশ প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এইভাবে ধর্মান্তরণ করলে আগামী দিনে বনবাসী সমাজ গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়বে। গত বছর এইরকম ভাবেই জামুগাড়িয়া গ্রামে ১৮টি সাঁওতাল পরিবারকে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে পঞ্চম মুর্মু নিজের ভুল বুঝতে পেরে হিন্দুধর্মে ফিরে এসেছেন। এখন তিনি এই ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষদের সচেতন করছেন।

# কেরলে স্বয়ংসেবক খুন : মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালের রাজধর্ম পালনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেরলের কান্নুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক স্বয়ংসেবক খুন হবার ঠিক একদিন পর রাজ্যপাল পি. সদাশিবম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে 'এই ধরনের আপত্তিকর ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য' ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। স্বয়ংসেবক খুন হবার পরেই রাজ্য বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানিয়েছিল, সিপিআইএম- নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রশ্রয়েই রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা বাড়ছে। প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং স্বয়ংসেবক এস টি রমেশ বলেন, 'স্বয়ংসেবক এবং বিজেপি কর্মীদের সাংগঠনিক কাজকর্ম করার অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ রাজনৈতিক হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে সিপিএমকে অভিযুক্ত করে বলেন, 'রাজ্যসরকার রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ আর গুণ্ডারাজ কায়েম করেছে।' তিনি পরে কাট্টায়াম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত স্বয়ংসেবক এবং বিজেপি কর্মীদের দেখতে যান। এদিকে কেরলের নাল্লেলা গ্রামে বিজেপির ডাকা বন্‌ধ সফল হবার পর তার জবাব দিতে সিপিএম গোমাংস ভোজের আয়োজন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যে অবৈধ কসাইখানার সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে। পঞ্চায়েতগুলির অধীনে কোনো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট না থাকায় কসাইখানার বর্জ্য পদার্থ যত্রতত্র পড়ে থাকে। মারাত্মক পরিবেশ দূষণ হয়। অসুখবিসুখ ছড়ায়। এরই প্রতিবাদে বিজেপি বন্‌ধ ডেকেছিল। সিপিএম তার জবাব দিয়েছে গোমাংসের ভোজসভার আয়োজন করে।

# প্রাচীন মন্দিরের পুনর্নির্মাণে সায় যোগী আদিত্যনাথের

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের বাহরিচ অঞ্চলে সহস্রাব্দ প্রাচীন গাজিবাবার দরগার পাশাপাশিই বর্তমানে বিনষ্ট প্রাচীন সূর্য মন্দিরের পুনর্নির্মাণের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দীর্ঘদিনের দাবিকে অনুমোদন দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

একাদশ শতাব্দীতে গাজি সৈয়দ সালার মাসুদের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন সূর্যবংশীয় রাজা সুহেলদেব। বাহারিচেই সেই যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল! যেখানে আগেকার সূর্যমন্দিরটিকে ধ্বংস করেই এতকাল বিরাজ করছে গাজির দরগা। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করে বলেছেন তিনি তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত।

প্রসঙ্গত ২০১৪ সালে বিজয়ী হওয়ার পর বিজেপির তরফে সুহেলদেবের স্মারক নির্মাণের প্রসঙ্গটি তোলা হয় এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের রাজা সুহেলদেবের মূর্তি উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর একটি গ্রন্থেরও প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত 'হিন্দু বিজয় উৎসব' শীর্ষক এক সভায় বক্তব্য রাখাকালীন যোগী বলেন গজনির সুলতান মামুদের ভাগ্নে ও প্রধান সেনাপতি গাজি মাসুদকে রাজা সুহেলদেব যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। সেই বিজয় স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখতে লক্ষ্ণৌয়ের সৈনিক স্কুলটির নাম তিনি রাজা সুহেলদেবের নামে করতে চান। একই সঙ্গে বাহরিচেও তাঁর স্মৃতিতে সূর্যমন্দির পুনর্নির্মিত হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা ভারতে আসফাক উল্লা খান, আবদুল হামিদ বা এপিজে আবদুল কালামের মতো ব্যক্তিদের সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে কিন্তু আজ সময় এসেছে ভেবে দেখার গজনির মামুদ, মহম্মদ ঘোরি, খিলজি, বাবর বা ঔরঙ্গজেবের মতো আক্রমণকারী শাসকদের আদতে দেশবাসীর কাছে কতটা সম্মান প্রাপ্য।

ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণয় নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার এই বিষয়গুলিকে মর্যাদা বিবেচনায় রাখবে বলে তিনি জানান।

# ইমাম বরকতির হুঙ্কার
# ‘পাকিস্তানের জন্য জিহাদে নামব’

**নিজস্ব সংবাদদাতা॥** কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম মৌলানা নূরুর রহমান বরকতি কেন্দ্রীয় সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা হলে সারাদেশের মুসলমান একজোট হয়ে পাকিস্তানের জন্য জিহাদ করবে। তিনি বলেন, ‘যদি নমাজ, আজান, কোরান এবং শরিয়ত আইন এদেশে নিষিদ্ধ হয় তাহলে জিহাদ শুরু হবে।’ তার জিজ্ঞাসা, ‘কেন ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে? কেন মুসলমান রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে না? কেন এদেশের তিরিশ কোটি মুসলমানকে আর একটা পাকিস্তান দেওয়া হবে না? আমরা পাকিস্তানের জন্য লড়ব।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সাবধান করে তিনি বলেন, ‘যদি ভারত সত্যিই হিন্দুরাষ্ট্র হয় এবং আজান, গোমাংস, কোরান এদেশে নিষিদ্ধ হয় তাহলে কিন্তু আমরা আপনাকেও ছাড়ব না।’ জিহাদ বলতে তিনি কী বোঝাচ্ছেন জানতে চাওয়া হলে বরকতি বলেন, ‘জিহাদ একবার শুরু হলে সব শেষ হয়ে যাবে। ঠিক যেমন আফগানিস্তান এবং বিশ্বের অন্য জায়গায় হচ্ছে।’ আরও বলেন, ‘আমরা গত একশো বছর ধরে জিহাদ করছি।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ইমাম বরকতির বিষোদ্গারের সূত্রপাত গাড়িতে লালবাতি লাগানোকে কেন্দ্র করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েক সপ্তাহ আগে মোদী সরকার এক নির্দেশ বলে ভি আই পিদের গাড়িতে লালবাতি লাগানোর প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম এখনও লালবাতি ব্যবহার করে চলেছেন। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে বরকতি বলেন, ‘তার দলনেত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে লালবাতি ব্যবহার করে যেতে বলেছেন।’ বরকতিকে এক সাংবাদিক মনে করিয়ে দেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই যেখানে কখনও লালবাতি ব্যবহার করেননি সেখানে এরকম নির্দেশ তিনি কীভাবে দিতে পারেন? এই সময় ক্ষুব্ধ বরকতিকে বলতে শোনা যায়, ‘অল্প বয়েসে মমতা সবকিছুই

খেতেন। এমনকী মটন বিরিয়ানি পর্যন্ত। এখন অবশ্য শুধু শশামুড়ি খান। তাই বলে আমরাও শশামুড়ি খাব নাকি?’

একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী— তদুপরি একজন মহিলা সম্বন্ধে এমন কুরুচিকর এবং দ্ব্যর্থবোধক মন্তব্য করার পরেও বরকতি থামেননি। তিনি বলতে থাকেন, টিপু সুলতান মসজিদের শাহি ইমামের গাড়িতে লালবাতি লাগানোর সিদ্ধান্ত যেহেতু ব্রিটিশ সরকার নিয়েছিল তাই তিনি লালবাতি ব্যবহার করবেন। ভারতের সংবিধান ব্রিটিশ আইনের ভিত্তিতে রচিত। সেই সংবিধান তাকে লালবাতি ব্যবহার করার অধিকার দেয়। তিনি এও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদি স্বয়ং তাকে অনুরোধ করেন তাহলেও তিনি তা মানতে বাধ্য নন। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে আলাদা। একমাত্র রাজ্যের নিজস্ব আইন ব্যতীত কেন্দ্রের কোনো আইন এখানে প্রযোজ্য নয়।

বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ইমামের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘ওর মন্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গালে থাপ্পড়ের মতো।’ রাজ্য বিজেপি অবিলম্বে ইমামের গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়েছে। নিন্দায় সরব মুসলমান সমাজও। দিল্লির জুম্মা মসজিদের শাহি ইমাম আবদুল বুখারি বলেন, ‘বরকতির ইমাম হবার কোনো যোগ্যতাই নেই।’ কিন্তু এই নিদারুণ নিন্দা সমালোচনার ঝড়ের মধ্যেও বাংলা সংবাদমাধ্যম আশ্চর্যরকম নির্জীব। বেশিরভাগ কাগজেই খবরটি বেরোয়নি। বোরোলেও বরকতির জিহাদতত্ত্ব সযত্নে সম্পাদিত হয়েছে।

সব দেখেশুনে বিস্মিত রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, বাংলা সংবাদমাধ্যম বলে আদৌ কিছু আছে তো? সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী টিপুসুলতান মসজিদ কর্তৃপক্ষ ইমামের বক্তব্যকে সমর্থন করেননি। এবং নিদারুণ চাপে গাড়ি থেকে লালবাতি খুলতেও বরকতি বাধ্য হয়েছেন।

## ফেসবুকে জয় শ্রীরাম, সিপিএম নেত্রী বহিষ্কৃত

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** শেষপর্যন্ত সিপিএম বর্ধমান জেলার নেত্রী সুপ্তি কাঞ্জিলালকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করল। এর কারণ সুপ্তি বন্ধুদের এপ্রিলফুল করার জন্য ১ এপ্রিল ফেসবুকে জয় শ্রীরাম লিখে একটি পোস্ট করেছিলেন। বিতর্ক মাথাচাড়া দেওয়ায় পরে মুছেও দেন। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি। রক্তাল্পতায় ভোগা সিপিএমের বর্ধমান জেলা নেতৃত্ব গেরুয়া সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে সুপ্তিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাভাবিকভাবেই সুপ্তি দলের এই সিদ্ধান্তে খুশি নন। নিজের ভুল স্বীকার করে তিনি দলেই থাকতে চান।

# সৌদি ফাঁদে পা দিয়ে দেশকে বিপজ্জনক দিকে ঠেলে দিচ্ছেন হাসিনা

**ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥** ৫৬০টি মসজিদ তৈরির প্রকল্পের জন্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানালেও সৌদি আরবের আর্থিক মদতের কারণে সেখানে জঙ্গি সংগঠন আই এস-এর উদ্ভাবক ওহাবি-সালাফিদের কেন্দ্র হওয়ার আশঙ্কা করছে আওয়ামি লিগ সমর্থক আওয়ামি ওলামা লিগ-সহ বিভিন্ন ইসলামি দল। ওলামা লিগ এই মসজিদগুলো ওহাবি- সালাফিদের মতবাদ প্রচারের কেন্দ্রে যাতে পরিণত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে। ইসলামি নেতারা বলেছেন, ওহাবি-সালাফি চিন্তাধারার ফসল হচ্ছে আজকের জামায়াতে ইসলামি, বিজবুত তাহরির, জামায়াতুল মোজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), নব্য জেএমবি, আনসারউল্লাহ বাংলা টিম, আহলে হাদিস, জাকির নায়েক ও আল বানিরা। আর এই ওয়াহাবি-সালাফি মতবাদের আন্তর্জাতিক ফসল হচ্ছে আইএস, আল সাবাব, বোকো হারাম, আল কায়েদা তালেবানের মতো উগ্র সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো। এই দাবিতে আওয়ামি ওলামা লিগ-সহ ১৩টি ইসলামি দল মানববন্ধন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। অন্য সংগঠনগুলো হচ্ছে সম্মিলিত ইসলামি গবেষণা পরিষদ, জাতীয় কোরান শিক্ষা মিশন, বাংলাদেশ ওলামা মাশায়েখ ঐক্যজোট, আওয়ামি ওলামা পরিষদ, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত, হাক্কানি আলেম সমাজ, জাতীয় ওলামা পরিষদ, বাংলাদেশ এতিমখানা কল্যাণ সমিতি, ইমাম মোয়াজ্জিন কল্যাণ পরিষদ, বাংলাদেশ ফেৎনা প্রতিরোধ কমিটি, আমরা ঢাকাবাসী ইত্যাদি।

কয়েকজন বুদ্ধিজীবী নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই প্রতিনিধিকে জানান, শেখ হাসিনা সৌদি ফাঁদে পা দিয়ে দেশকে এক বিপজ্জনক ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে শেখ হাসিনা সৌদি প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। কিন্তু এর অন্য পিঠ খতিয়ে দেখেননি। সৌদি আরব এভাবেই চরম উগ্র ওহাবি-সালাফি মতবাদ রপ্তানি করে। বুদ্ধিজীবীরা প্রশ্ন তুলেছেন, যে দেশটি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করেনি, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নির্বিচারে বাঙালি হত্যায় মদত দিয়েছে, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, সেই দেশটি হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধু-কন্যার এতো কাছাকাছি এলো কীভাবে? তাঁরা আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সৌদি আরব স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক জামায়াত নেতাদের সেদেশে আশ্রয় দিয়েছিল। হজের অনুমতি পর্যন্ত দেয়নি। বাংলাদেশের হাজিদের হজ করতে হয়েছে ভারতীয় হজযাত্রীদের সঙ্গে।

# সেল কোম্পানি ব্যবহার করে ‘আপ’ পার্টির তহবিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** আপের সাসপেন্ড হওয়া মন্ত্রী কাম বিধায়ক কপিল মিশ্রের অভিযোগ অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের ঘনিষ্ঠ কিছু লোকজন বিভিন্ন জাল (সেল) কোম্পানি তৈরি করে তার মাধ্যমে কোটি কোটি বেহিসেবি টাকা আপের তহবিলে পাচার করেছেন।

এই সেল কম্পানিগুলি তৈরিই করা হোত আপের খাতায় কেজরিওয়ালের ঘনিষ্ঠদের কালোটাকা স্থানান্তর করার উদ্দেশে। লেনদেন হয়ে যাওয়ার পর আপ সরকার এই অসৎ সংস্থাগুলিকে উপকার পাওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোটি কোটি টাকার সরকারি কাজের বরাত পাইয়ে দিত বলে মিশ্র দাবি করেন।

সংবাদসূত্র অনুযায়ী এর প্রত্যুত্তরে আপ মুখপাত্র চিরাচরিতভাবে বিজেপি চক্রান্তের জিগির তুলে বলেছেন আপকে নির্বাচন কমিশনের কাছে বেআইনি ঘোষণা করানোর উদ্দেশ্যেই এই গল্প ফাঁদা হয়েছে। মুখপাত্র জানান, কপিল মিশ্র এখন বিজেপির শেখানো বুলিই আওড়াচ্ছেন। ইতিমধ্যে মায়াবতীর দীর্ঘদিনের লেফটেন্যান্ট সিদ্দিকীও তাঁর ভূতপূর্ব নেত্রীর বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার প্রমাণ স্বরূপ টেপ বাজারে ছেড়েছেন। একই সঙ্গে লালু ও তাঁর কন্যার দিল্লিতে একই রকম সেল কোম্পানির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা জালিয়াতি করে সম্পত্তি হাতানোর অভিযোগ উঠেছে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে তদন্ত করানোর দাবি জানিয়েছেন। পাশোয়ান বলেন, তিনটি ক্ষেত্রেই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুর এই জালিয়াতির অভিযোগ সম্পর্কে নীরব যা অত্যন্ত অর্থবহ। কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে আরও কিছু দুর্নীতির অভিযোগ ইতিপূর্বেই সামনে এসেছে। এই মর্মে মায়াবতীর হিসেব বহির্ভূত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বানানোর প্রসঙ্গ তুলে তিনটি ক্ষেত্রেই জনতার অর্থ তছরূপের অভিযোগে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান শ্রী পাশোয়ান।

# নদী সংরক্ষণে নর্মদা মিশনই পথিকৃৎ : নরেন্দ্র মোদী

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ সারাদেশে নদী সংরক্ষণের প্রশ্নে নর্মদা সেবা যাত্রাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নর্মদা মধ্যপ্রদেশের লাইফলাইন। বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা এই নদীর ওপর নির্ভরশীল।' নর্মদা সেবাযাত্রাকে সারাবিশ্বে বিরলতম বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, নর্মদা মিশনের মতো প্রকল্প যদি রাজনৈতিক নেতা বা রাজ্য সরকার গ্রহণ না করতেন তাহলে এর কথা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ত।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নর্মদা কনজারভেশন অ্যাকশন প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহকে বলেন তার সাফল্যের কথা প্রতিটি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে। যাতে তারাও যে যার রাজ্যের নদী বাঁচাতে নর্মদাকে অনুসরণ করতে পারেন।

## উবাচ

"ইন্দিরা গান্ধী আমায় বলেছিলেন, ইতিহাস মাঝে মাঝে কঠোর পদক্ষেপ প্রত্যাশা করে। হয়তো পরবর্তীকালে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয় কিন্তু সেই সময় ওই পদক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।"

**প্রণব মুখোপাধ্যায়**
ভারতের রাষ্ট্রপতি

*আধুনিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে।*

"লেফটেন্যান্ট উমর ফৈয়াজের হত্যাকাণ্ডের পর কাশ্মীরি যুবকদের আত্মবিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। তাদের উচিত সন্ত্রাসবাদের মদত দাতাদের মুখোশ খুলে দেওয়া।"

**জেনারেল বিপিন রাওয়াত**
সেনাপ্রধান

*নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে কাশ্মীরি যুবকদের আচরণ প্রসঙ্গে।*

"হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ নয়। সেই কারণেই মুসলমানরা ১০০০ বছর ধরে আমাদের দেশ শাসন করেছে। তাদের পর এসেছে ব্রিটিশরা।"

**পি কে বেজবড়ুয়া**
টি বোর্ডের চেয়ারম্যান

*হিন্দু ঐক্য নির্মাণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা প্রসঙ্গে।*

"আদালত যদি তিন তালাক প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমানদের বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত নতুন আইন প্রণয়ন করবে।"

**মুকুল রোহতাগি**
অ্যাটর্নি জেনারেল

*মুসলমানদের বিশেষ ব্যক্তিগত আইন প্রদত্ত অধিকার প্রসঙ্গে।*

"আদালতে শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যায় না। পাকিস্তান যদি উল্টোপাল্টা কিছু করে তাহলে তা ভিয়েনা চুক্তি লঙ্ঘন করা হবে।"

**হরিশ সালভে**
আইনজীবী

*আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতে কুলভূষণ যাদবের মৃত্যুদণ্ড রদ করা প্রসঙ্গে।*

# সাবধান, মোদী হঠাতে চোরেদের মহাজোট গড়ছেন দিদি

গূঢ় পুরুষের
কলম

হ্যাঁ, সরাসরি বলছি তৃণমূল কংগ্রেস দলটি ঘুষখোর, তোলাবাজদের দল। তাই ভোটের সময় ঘুষ বা তোলাবাজির টাকা নেওয়ার অভিযোগে ভোটপ্রার্থীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জ গঠন হলেই প্রার্থীর সদস্যপদ বাতিল হবে বলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যে সুপারিশ করেছে তার প্রবল বিরোধিতা করেছে বাংলার ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল। এই দলের বক্তব্য, আদালতে চার্জশিট জমা দিলেই দলীয় প্রার্থী দুর্নীতিবাজ হয় না। সিবিআই চার্জশিট জমা দিলে আদালতে মামলা চলবে। অভিযুক্ত প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিতে হবে। নিম্ন আদালত থেকে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত মামলা চলবে। আইনি যুদ্ধের শেষে শীর্ষ আদালত যদি অভিযুক্ত প্রার্থীকে অপরাধী ঘোষণা করে তবেই দলীয় সদস্যপদ খারিজ করা যেতে পারে। তার আগে নয়। দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের তিন প্রতিনিধি মুকুল রায়, সুব্রত বক্সি এবং সুখেন্দুশেখর রায় তাঁদের দলীয় নেত্রীর এই বক্তব্য বৈঠকে জানিয়ে দেন।

মুকুলবাবুরা জানান, দিদি তাঁদের বলে দিয়েছেন যে নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ ন্যায় বিচারের প্রাথমিক শর্তকেই লঙ্ঘন করেছে। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত আদালতের রায়ে কেউ দোষী সাব্যস্ত না হন ততক্ষণ তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হয় না। আদালত অভিযোগের সারবত্তা খুঁজে পেলেই পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থাকে চার্জশিট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তার মানে এই নয় যে যার বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে সে দোষী। এক্ষেত্রে তাঁকে অভিযুক্ত বলা হবে। আর কেবল অভিযোগের ভিত্তিতে কারও সদস্যপদ খারিজ করা যায় না। তৃণমূলের অস্বস্তির কারণটা বাংলার মানুষ বোঝেন। সারদা, রোজভ্যালি, অ্যালকেমিস্ট, এমপিএস ইত্যাদি চিটফান্ডের আর্থিক প্রতারণায় তৃণমূলের চুনোপুঁটি নেতা থেকে দলের রাঘব বোয়াল নেতারা জড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র নারদ ঘুসকাণ্ডেই তৃণমূলের ১২ জন সাংসদ-মন্ত্রী ভোটের সময় হাত পেতে ঘুস নিচ্ছেন তা ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। টিভির পর্দায় সেই ছবি সারা দেশ দেখেছে। এখন নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হলে পুরো তৃণমূল দলটাই বরবাদ হয়ে যাবে।

মমতা যখনই সর্বভারতীয় বিরোধী দলের জোট-নেত্রী হওয়ার খোয়াব দেখেন তখনই তাঁর দলের ঘুসখোর নেতারা জল ঢেলে দেন। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র অথবা নিছকই কাকতালীয় ঘটনা কিনা জানি না। মনে আছে, প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতিপদে তাঁকে সমর্থন করার জন্য দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করছেন তখন দিল্লিতে বসে মমতা সমাজবাদী পার্টির নেতা মুলায়ম সিংহের সঙ্গে বসে ষড়যন্ত্র করছিলেন কীভাবে প্রণববাবুকে হারানো যায়। পরে অবশ্য মুলায়ম নেত্রীকে পথে বসান। মাঝখান থেকে বাংলার সমাজবাদী নেতা কিরণময় নন্দ নেত্রীকে বেইজ্জত করার পুরস্কার পান সমাজবাদী পার্টির টিকিটে উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার সদস্য হয়ে। পুরনো ঘটনার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে বাংলার বাইরে মমতার পরিচিতি 'সততার প্রতিমূর্তি' হিসেবে। তিনি যে একটি দুর্নীতিপরায়ণ দলের প্রধান মালকিন বাংলার বাইরে কতজন জানেন! কেন্দ্রের বিজেপি মন্ত্রীরা পর্যন্ত কলকাতায় মমতাজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তখন বোঝা যায় মমতার ছদ্মবেশ কতটা নিখুঁত। তাঁর অভিনয় কতটা নিখুঁত।

দেশের অন্যদলের মমতা-ভক্তরা সততার অভিনয়ে পুরোপুরি ফ্লপ। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল মাত্র ২ কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে এখন বিপাকে। মমতার মতো দৃঢ়ভাবে বলতে পারছেন না যে ওটাতো অভিযোগ। আদালতে প্রমাণিত নয়। তাই তিনি ঘুস নেননি। সারা দেশ টিভিতে দেখলো তৃণমূলের ঘুসখোররা হাত পেতে টাকা নিচ্ছে। তারপরেও মমতা বললেন, ক্যামেরা, ছবি সবই জালিয়াতি। গ্র্যাফিক্সের প্রযুক্তিতে অন্য ব্যক্তির ধড়ে তৃণমূলের নেতাদের মাথা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সকলে ধন্য ধন্য করতে শুরু করলো। বাংলার সাধারণ মানুষ ভাবলেন সততার প্রতিমূর্তি যখন বলছেন ছবি জালি তখন তাই হবে। ভোটে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে ঘুসখোরা মন্ত্রীর কুরশিতে বসে ঘুসের কারবার আরও বড় করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চুরির টাকার বখরা নিয়ে তৃণমূলের সশস্ত্র শরিকদের সংঘর্ষ দাপাদাপির ঘটনা প্রতিদিন খবরের কাগজে পড়ছেন। একবারও কী মনে হয় না এই দুষ্কৃতীদের কবল থেকে বাংলাকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। মমতা নরেন্দ্র মোদী-বিজেপিকে হঠাতে এখন মহাজোট গড়ার ডাক দিয়েছেন। কেন? চোরেদের বাঁচাতে? লালুপ্রসাদ যাদব নিজে এবং তাঁর পুত্রকন্যারা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত। সোনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার আয়কর ফাঁকির মামলা, বিএসপি নেত্রীর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ চাপা দিতেই কি মমতা মহাজোটের ডাক দিয়েছেন? প্রশ্ন হচ্ছে, চোরেদের এই মহাজোট করা যাবে কি? চোরে চোরে মাসতুতো ভাই কথাটা জানা আছে। কিন্তু চোরে চোরে মহাজোট কথাটা বাংলা ভাষায় নয়া সংযোজন। ▌

# দিদির গলায় কাঁটা ফুটিয়াছে

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
চেয়ারপার্সন, তৃণমূল কংগ্রেস
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা

দিদি, গলাটা দেখিয়েই নিন। কাঁটা ফুটে থাকা ভাল নয়। পদ্ম কাঁটায় বিষ নেই। কিন্তু এখন আপনার গলায় যে কাটা ফুটেছে তাতে অনেক বিষ। তাই সাবধানে থাকুন।

দিদি, আপনি মুখ্যমন্ত্রী। আপনার ঘনিষ্ঠ বৃত্তে আসার জন্য মুখিয়ে থাকেন অনেকেই। কে আপনার গাড়িতে উঠলেন, মঞ্চে পাশে বসলেন, কার সঙ্গে আপনি হেসে কথা বললেন, এই নিয়ে সাপ-লুডোর খেলা চলতেই থাকে। কিন্তু দিদি, ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে ধর্মতলার মোড়ে টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম মৌলানা নুর উর রহমান বরকতির হরকতে আপনি সত্যিই বিপদে।

'পরিবর্তনের আন্দোলনে' ইমাম বরকতির 'অবদান' ভোলা যাবে না। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে অটুট রাখতে যে সমস্ত ধর্মীয় নেতা তৃণমূলকে সাহায্য করেছিল, ইমাম সাহেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ হোক বা অন্য মঞ্চে জনমত তৈরিতে টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সব সময়ে আপনার পাশে থেকেছেন। এখন একটানা মোদী-বিজেপি-আর এস এস বিরোধিতায় আপনার বৃহত্তর অ্যাজেন্ডাকে সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন তিনি। আপনার হয়ে উনিই তো ফতোয়া দেন। মোদীকে খতম করার কথা বলেন। কিন্তু তাই বলে পাকিস্তান গঠন করার কথা বলবেন! আর তার পরেও আপনি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না!

এই সত্যটা জেনেই বরকতি আপনাকে বিপাকে ফেলছেন। দিদি, যা দেখছি এতদিন আপনি যে অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, যাঁদের ব্যবহার করেছেন তাঁরা সবাই এখন আপনার দিকে ধেয়ে আসছে।

এখন বরকতিকে মুসলমানরাও চাইছেন না। কারণ, তিনি ধর্মের বদলে রাজনীতি করেন বেশি। ইমামের কাজ না করে নোংরামি করেন। টিপু সুলতান মসজিদের সুনাম নষ্ট করছেন। এমন অনেক অভিযোগ তুলেছে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ ওয়াকফ এস্টেট। এই এস্টেটই টিপু সুলতান মসজিদ পরিচালনা করে। কলকাতা হাইকোর্টের তৈরি করে দেওয়া এই এস্টেটের মোতায়াল্লি তথা ম্যানেজার আনোয়ার আলি শাহ, টিপু সুলতানের বংশধর। ওই পরিবারের আর এক বংশধর শাহিদ আলম ও আনোয়ার আলি শাহ জানিয়েছেন, লাল বাতি নিয়ে বিতর্কের অনেক আগে থেকেই তাঁরা ইমাম বরকতিকে সরানোর চেষ্টা করছেন। এতদিন রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী বরকতির বিরুদ্ধে সেভাবে মুখ খুলতে না পারলেও এখন তাঁরা রীতিমতো সরব। ইমামকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তই শুধু নয়, অন্যায়ভাবে ছেলের চাকরি ও হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে বেশ কয়েকবার কারণ দর্শানোর চিঠিও পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মোতায়াল্লি আনোয়ার আলি শাহ।

কিন্তু দিদি, ইমাম সাহেবকে রাজনীতিতে কে নামিয়েছে? কে তাকে 'শাহি ইমাম' পরিচয় দিয়েছে? কোনো বাদশা, কোনো রাজাকে তিনি নমাজ পড়াননি। সুতরাং তিনি 'শাহি' হতে পারেন না। তিনি একজন বেতনভুক ইমামের চাকরি করেন। নুর-উর রহমান বরকতি আদৌ ধর্মগুরু নন। মসজিদের বেতর পাওয়া কর্মী। তিনি আদৌ বউবাজার থানায় কাজি নন। তিনি মানিকতলা থানা এলাকার কাজি। সেখানে অন্য একজনকে বসিয়ে রেখে তিনি বকলমে কাজ চালান। কার মদতে?

ছেলে সৈয়দ মহম্মদ খালেদকে কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি পাইয়ে দেন। চাকরি দেওয়ার জন্য পুরসভা উর্দু ট্রান্সলেটরের নতুন পদ তৈরি করে। যদিও সৈয়দ মহম্মদ খালেদ কাশিপুরে থানা এলাকার কাজি। আরও দুই ছেলের চাকরির ক্ষেত্রেও ইমাম বরকতি প্রভাব খাটিয়েছেন বলে অভিযোগ। আপনার মদত ছাড়া কি এসব সম্ভব দিদি?

আপনার প্রিয় নূর-উর রহমানি বরকতির বিরুদ্ধে হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তিরও অভিযোগ রয়েছে। টিপু সুলতান মসজিদ পরিচালকদের বক্তব্য, যে টাকা তিনি ইমাম হিসেবে পান তাতে এমন বিলাসবহুল জীবন যাপন সম্ভব নয়। দু'দুটো দামি গাড়ি রয়েছে তাঁর। প্রত্যেক ইমামকেই মসজিদে একটি ঘর দেওয়া হয়। তাকে বলা হয় হুজরা। এই ঘর ধর্মপুস্তক পাঠ ও সাধারণকে সৎ পরামর্শ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেখানে বিনা অনুমতিতে কলকাতা পুরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স বের করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নাম— টিপু সুলতান ইসলামিক সেন্টার। মালিক— নুর-উর রহমান বরকতি। এমন দুর্নীতি কী করে সম্ভব দিদি! আপনি কিছু জানতেন না?

হায় রে! এখন রাম নাম নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তিনিই আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন। মুসলমান ভোটও যে যেতে বসেছে দিদি!

বরকতি কাঁটা কষ্ট দিচ্ছে? কিন্তু, কোনো ডাক্তারের কর্ম নয় সে কাঁটা বের করা। গিলতেও পারবেন না। ওগরানোর চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

**—সুন্দর মৌলিক**

# সংবিধানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দদু'টি অস্পষ্ট, জটিল ও বিভ্রান্তিকর

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

এটা লক্ষণীয় যে, আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় গোড়াতে সমাজতন্ত্র ('সোশ্যালিজম্') এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ('সেকুলার') শব্দ দুটো আদৌ ছিল না— তাতে ছিল 'সভ্‌রেন ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক' কথাগুলো। তার অর্থ হলো— রচয়িতারা ভারতকে একটা সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে

সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে 'সোশ্যালিস্ট' ও 'সেকুলার' শব্দ দুটো যুক্ত হয়েছে। অনেকে মনে করেন, এর ফলে আমাদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও আদর্শ আরও ব্যাপ্ত ও পর্যাপ্ত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে কল্যাণ-চেতনা।

এটা ঠিক যে, এই প্রস্তাবনায় সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়, ঐক্য ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের মূল্যবোধের কথাও যুক্ত করা হয়েছিল। ড. এস. সি. কাশ্যপ তাই মন্তব্য করেছেন— 'They embody the highest values that human ingenuity and experience have been able to develop these for'— (আওয়ার কনস্টিটিউশান, পৃ. ৫২)। কিন্তু রচয়িতারা তাতে সঙ্গত কারণেই সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আদৌ উল্লেখ করেননি।

এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, মহাত্মা গান্ধী ছাড়া তৎকালীন ভারতের প্রায় সব রাজনৈতিক নেতা ও চিন্তাবিদরা সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদে ছিলেন। কংগ্রেস তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা হলেও তার নেতারা চেয়েছিলেন প্রত্যেক রাজ্যের যোগ্য ব্যক্তিরা গণপরিষদে স্থান লাভ করুন এবং তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় একটা অতুলনীয় সংবিধান তৈরি হোক— (গ্রেন্‌-ভিন্‌ অস্টির— দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশান, পৃ. ৮৯)। তখন ২৯৬ টা আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২১১টিই দখল করেছিল। কিন্তু এই বিপুল প্রাধান্য সত্ত্বেও এই দল গণপরিষদ ও খসড়া কমিটিকে দলীয় সংস্থায় পরিণত করেনি। সংবিধান রচনার জন্যে খসড়া কমিটির সভাপতি করা হয়েছিল কংগ্রেস-বিরোধী আইনজ্ঞ ড. বি আর আম্বেদকরকে। অন্য সদস্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অ-কংগ্রেসি--- ড. কে এম মুন্‌সী, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, সৈয়দ সাদাতুল্লা, এন মাধব রায় এবং ডি. পি. খৈতান। আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে প্রায় তিন বছরে সংবিধানটি রচিত হয়েছে। সর্বোপরি, গণপরিষদের উপদেষ্টা ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ (আন্তর্জাতিক আদালতের অন্যতম বিচারক) স্যার বি এন রাউত।

তার ফলে পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান রচিত হয়েছে আমাদের জন্য। খসড়াটা গণপরিষদে উপস্থাপিত করার সময় ড. আম্বেদকর দাবি করেছিলেন, সেটা হয়েছে 'good and workable'। কিন্তু কয়েক দশক পরে আমাদের সাংসদদের মনে হয়েছে, একটা খামতি থেকে গেছে, তাই তাঁরা সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংযুক্ত করেছেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এটার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ ওই দুটো শব্দের অর্থই অস্পষ্ট, জটিল ও কিছুটা বিভ্রান্তিকর। তাছাড়া শব্দদুটির দ্বারা যে ধারণাগুলোর আভাস পাওয়া যায় বা বোঝায়, সেগুলো মূল সংবিধানেই নিহিত ছিল।

প্রথমে সমাজতন্ত্রের কথা বলি। এই শব্দটার দ্বারা একটা শোষণমুক্ত, সমতাযুক্ত সমাজের কথা বোঝায় যেখানে বৈষম্য, বিভেদ থাকে না এবং কিছু ব্যক্তির স্বার্থ ও ও লোভের শিকার বহু মানুষকে হতে হয় না। ড. বি.সি. রাউত মন্তব্য করেছেন— এতে বোঝা যায় ভারত সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে (ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৭৬)।

কিন্তু ড. এস.এল. সিক্রি জানিয়েছেন,

শব্দটার অর্থ স্পষ্ট নয়— 'The meaning of socialism has undergone a long process of re-definition and re-evaluation'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট্ অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৯০)। উদ্ভবের পর থেকে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে গেছে তার সংজ্ঞা। নানা জনে তার নানা ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার ফলে এই তত্ত্বের মধ্যেই এসেছে 'গিল্ড সোশ্যালিজম্, 'সিন্ডিক্যালিজম্', 'ফেরিয়ান সোশ্যালিজম্,' 'কমিউনিজম্', 'ইওরোকমিউনিজম্' ইত্যাদি তত্ত্ব। এই কারণে সি. ডি. বার্নস্ মন্তব্য করেছেন— প্রায় সবাই এই তত্ত্বের কথা বলেন ('the socialist ideal is a sentiment to many'), অথচ তাদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতপার্থক্য— (পলিটিক্যাল আইডিয়াল, পৃ. ২০১)। আরও স্পষ্ট করে সি. ই. এম. জোয়াড লিখেছেন— এটা একটা টুপির মতো— সবাই মাথায় দিয়ে এর আকৃতিই নষ্ট করে দিয়েছেন— 'Socialism is like a hat which has lost its shape because everybody wears it'--- (মডার্ন পলিটিক্যাল থিয়োরি, পৃ. ৪০)। আমাদের সংবিধান এর ব্যাখ্যা দেয়নি বা জানায়নি কোন্ ধরনের সমাজতন্ত্র তার পছন্দ। ড. এস.সি. কাশ্যপের ভাষায়— 'It means different things to different people— (আওয়ার কনস্টিটিউশান, পৃ. ৫৭)। তবে যদি এর দ্বারা একটা মুক্ত ও বৈষম্যহীন, শোষণহীন ও ন্যায্য ব্যবস্থা বোঝানো হয়, তাহলে প্রস্তাবনাতেই তার ইঙ্গিত মেলে। কারণ তাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, ন্যায় কথাগুলো আছে। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে নির্দেশমূলক নীতি— তাতেই রয়েছে সাম্য, সেবা, মুক্তি ও শোষণহীন, সমৃদ্ধ জীবন প্রতিষ্ঠার কথা।

ঠিক তেমনি, 'সেকুলার' শব্দটার কোনো দরকার ছিল না। তাছাড়া এর অর্থও অস্পষ্ট। মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ রাজার শাসনাধীনে থাকলেও, রোমের পোপ ছিলেন সমগ্র খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু। তিনি ও তাঁর অধীনস্থ যাজকরা ছিলেন রাজ-ক্ষমতার উর্ধ্বে। তাঁরা সমগ্র ইউরোপের ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করতেন।

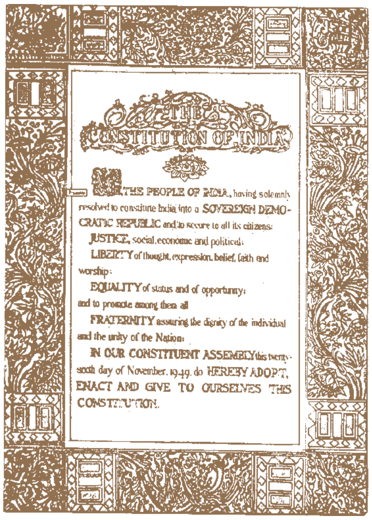

THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

অনেক শাসনবিষয়ক ব্যাপারও ছিল তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

জার্মানির মার্টিন লুথার, ফ্রান্সের ক্যালভিন, ব্রিটেনের রাজা অষ্টম হেনরি প্রমুখ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে ক্রমে পোপ ও যাজকদের ক্ষমতা খর্ব হয় এবং রাজকীয় এক্তিয়ার বৃদ্ধি পায়। সেই থেকে 'সেকুলার রাষ্ট্র'-তত্ত্ব জন্ম নিয়েছে। তার অর্থ হলো— ধর্মটা যাজকদের, কিন্তু রাষ্ট্র (শাসক) এক পৃথক রাজনৈতিক সত্তা। এর দ্বারা মোটামুটিভাবে ধর্ম থেকে রাজনীতির পৃথকীকরণ বোঝায়।

কিন্তু অনেকে এই শব্দটির দ্বারা ধর্ম-বিরোধিতা বোঝান। ড. বিদ্যাধর মহাজন মন্তব্য করেছেন, 'In India, the term secularism is interpreted as if India has no religion'— (দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৫৬)। কিন্তু অভিধানে এর নানা অর্থ করা হয়েছে।

কিন্তু সংবিধান-সংশোধনকারীরা বোঝাতে চেয়েছেন, ভারত- রাষ্ট্রের কোনো বিশেষ ধর্ম নেই— ব্যক্তি এখানে তাঁর ইচ্ছে ও বিশ্বাসমতো ধর্মমত গ্রহণ, পালন ও প্রচার করতে পারেন এবং ন্যায্য কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া যায় না। ড. এম. ভি. পাইলির ভাষায়— 'No particular raligion will be identified as state religion, nor will it recieve any state-patronage on preferential status'--- (ইন্ডিয়ান'জ কনস্টিটিউশান, পৃ. ৩৪)। কিন্তু এর জন্য 'সেকুলারিজম্' শব্দটি না বসালেই চলত। কারণ 'মৌলিক অধিকার' অধ্যায়ের ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অভিধানে এই শব্দটির অর্থ কোথাও 'not spiritual', কোথাও 'irreligious', কোথাও 'utilitarian ethics' ইত্যাদি আছে। এই জটিলতা এড়ানোর জন্যই সংবিধান রচয়িতারা 'সেকুলার' শব্দটি ব্যবহার না করে বরং তার নির্যাসটা মূল সংবিধানেই রেখেছিলেন। ড. এ.সি. কানুর তাই মন্তব্য করেছেন— 'Principles of secularism, are, howerver, embodied in the various provisions of the constitution— (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ১২১)।

এই সব কারণে প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু মনে করেন— 'it is obvious that both these words are vague and relate to the basic structure'— (কনস্টিটিউশানাল ল অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২)। তাঁর মতে, সংবিধান একটা আইনগত ব্যাপার, এতে অস্পষ্ট কোনো শব্দ থাকা আদৌ উচিত নয়। তিনি লিখেছেন, সংবিধান হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন। সুতরাং অস্পষ্ট, বিতর্কিত ও বিভ্রান্তিমূলক কোনো কথা এতে স্থান পেতে পারে না। 'সেকুলার' শব্দটাই বিভ্রান্তিকর। আর 'সোশ্যালিজম্' তত্ত্বটা কোথাও রূপ পায়নি। ড. স্টিফেন লীককের ভাষায়— এটা একটা 'more an ideal than actuality'— (এলিমেন্টস্ অব পলিটিক্স, পৃ. ৩৫০)।

সুতরাং এই ধরনের শব্দকে পরিহার করাটা সঙ্গত বলে সংবিধান রচয়িতারা মনে করেছিলেন। অথচ তাঁরা এই দুটো তত্ত্বের মূল ধারণাগুলো সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে রেখেছেন। সংবিধান-সংশোধনকারীরা এটা কিন্তু বুঝতে পারেননি— তাঁদের মনে হয়েছে তাঁরা বিপ্লবাত্মক কিছু করেছেন।

# আর টি ই-র উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসার, স্কুল বন্ধ করা নয়

**বিমলকৃষ্ণ দাস**

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অবশ্যই ধন্যবাদার্হ, তিনি কথা রেখেছেন; সরকার পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে বিদ্যাভারতীর স্কুলগুলি বন্ধ করার কাজ, উপলক্ষ্য আর টি ই। সাধারণ অভিভাবক, সাধারণ নাগরিক অনেকেই বুঝতে পারছেন না বিষয়টি কী— যা নিয়ে এত হৈচৈ, সরকারি এমন পদক্ষেপ!

R.T.E. হলো "The right of children to free and compulsory education act-2009" অর্থাৎ 'বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯'। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এরকম : ১৯৫০ সালে সংবিধানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে (২১-এ)। সময়সীমা ছিল ১০ বছর। কিন্তু ১৯৮১ পর্যন্ত সাক্ষরতার হারই দাঁড়িয়েছিল ৪৩.৫৭ শতাংশ। ১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে আন্তর্জাতিক স্তরে শিশুর অধিকার বিষয়ক একটি সনদ তৈরি হয়। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার এই সনদ মেনে শিশুর অধিকার রক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ২০০১-০২ সাল থেকে দেশের সমস্ত জেলায় সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয়। ২০০৫ সালে শিশুদের অধিকার রক্ষা নিশ্চিত করতে তৈরি হয় 'National Commission For Protection of Child Right'। সর্বশিক্ষা অভিযানের যে লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-এর মধ্যে সমস্ত শিশু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করবে— তা নানা কারণে বহুলাংশেই বিফল হয়েছে। এবার শিক্ষার অধিকারকে সমস্ত শিশুর জন্য বাস্তবায়িত করতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার তাদের মতো নিয়মাবলী তৈরি করে। ২০১০-এ হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নিয়ম কার্যকরী করে ২০১২ সালে এবং ২০১৩ সাল থেকে সমস্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে স্কুল পরিচালনায় এন ও সি নিতে (আর টি ই অনুযায়ী) নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন হঠাৎ কিছু না বোঝায় স্কুলগুলির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য শুরু হয়। তবুও নিয়মানুসারে গ্রামে ৩ হাজার টাকা ও শহরে ৫ হাজার টাকা জমা দিয়ে বেশিরভাগ স্কুল আবেদন করে। নিয়মানুসারে জেলা পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করে বিদ্যালয়কে লিখিত জানাবেন তার কী অভাব আছে তা পূরণ করার জন্য। এক্ষেত্রে, পরিদর্শন হয়তো হয়েছে, মুখে কিছু বলেছেন— কিন্তু প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই লিখিত কিছু দেওয়া হয়নি। এভাবেই চলছিল। হঠাৎ, ২০১৭-তে একটা তোলপাড় অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিশেষ করে বিদ্যাভারতীর স্কুলগুলিকে ডি.আই. ডেকে পাঠাতে লাগলেন। সারদা শিশুতীর্থ, শিশুমন্দির, বিদ্যামন্দির নামে যত স্কুল আছে প্রায় সকলকে। এর পেছনের কারণটিও সবার জানা। ৮ মার্চ বিধানসভায় বিরোধী পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চাওয়া হয়, সারদা শিশুতীর্থ, শিশুমন্দির, বিদ্যামন্দির নামে স্কুলগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে কিনা, এগুলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্কুল, হিন্দুত্ববাদ ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। পার্থবাবু উত্তরে জানান— 'স্কুলে কোনোরকম ধর্মীয় শিক্ষা, হিন্দুত্ববাদের শিক্ষা বরদাস্ত করা হবে না, প্রমাণ পেলে সব বন্ধ করে দেবেন। ইতিমধ্যে, শ'খানেক স্কুলের তালিকা করে তদন্তের কথা বলা হয়েছে'। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এত ডাকা খোঁজা। এর পূর্বে আবেদনপত্রের সঙ্গে সতেরো পয়েন্টের একটি হলফনামা জমা দিতে হয়। বিদ্যালয় কাঠামোগত বহু বিষয় আবেদনপত্র পূরণ করে জানাতে হয়েছে— জমি, বিদ্যালয় গৃহ (৪০০ বর্গফুট), সমিতি/ট্রাস্ট, অডিট রিপোর্ট, শিক্ষক তালিকা ইত্যাদি। কিন্তু হলফনামায় এমন কয়েকটি বিষয় ছিল যা সাধারণ বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব করা দুরূহ। যেমন--- (১) সরকারি নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো অনুসরণ, (২) সরকারের ডি.এল.এড. প্রশিক্ষিত হতে হবে ইত্যাদি। এর কোনো একটি অপূর্ণ অবস্থায় থাকলে আর টি ই আইনের ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী সেই স্কুলকে বন্ধ করে দিতে বলা হবে। এরপরে, স্কুল চালালে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

ও প্রতিদিনের জন্য ১০ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা আছে। তাহলে কী হবে! কেন্দ্রীয় আইনে বলা হয়েছে সরকার এই বিদ্যালয়গুলিকে শর্তাবলী পূরণ করতে সময় দিয়ে বা প্রয়োজনানুসারে সহযোগিতা করবে। কিন্তু এখানে সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। ইতিমধ্যে ১১টি বিদ্যালয়কে এরকম বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বলা যায় না কত বিদ্যালয় সমগ্র শর্তাবলী এক্ষুনি পূরণ করতে পারবে। অদ্ভুত বিষয়, এই নিয়মাবলীর কোথাও বলা হয়নি

এন ও সি-র জন্য বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন স্তর, শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ, সমাজে বিদ্যালয়ের প্রভাব ইত্যাদি দেখা হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উঠে আসে যে প্রশ্নগুলি— (১) সমস্ত বিদ্যালয় রেজিস্টার্ড সোসাইটি বা ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত, তবে তা আর এস এস-এর স্কুল কী করে হলো? (২) সরস্বতী বন্দনা, প্রার্থনা, বন্দে মাতরম্, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, দেশাত্মবোধের শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, পিতামাতা গুরুজনদের প্রতি, পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে শেখানো কি হিন্দুত্ববাদ? ভারতীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে নৈতিক শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটানো কি অপরাধ? (৩) হলফনামা করে এই বেসরকারি স্কুলগুলিকে যা যা করতে বলা হচ্ছে, তার কটা সরকারি বিদ্যালয়ে আছে? আর টি ই অ্যাক্ট তো সারা দেশের (কাশ্মীর বাদে) জন্য। পরবর্তী প্রশ্ন আসে মাদ্রাসা নিয়ে, তারা কি এই নিয়মের বাইরে? আপাতত উত্তর হ্যাঁ। সংবিধানের Article 30 (1) অনুযায়ী তাদের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না (All minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their choice)।

প্রশ্ন, তাহলে শিশুদের শিক্ষা অধিকার রক্ষা কি সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই, তারাও তো এদেশের নাগরিক? এখানে বৈপরীত্য কেন হবে? তাহলে সংবিধানের একেবারে প্রথমে ভূমিকা অংশে যে রয়েছে— Equality of status and opportunity and to promote among them all-এর কি কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না? সংখ্যালঘুর স্কুলে কোনো অপরাধ নেই, সেখানে নিজস্ব ধর্মীয় পাঠ্যক্রম যা খুশি চলবে, আর সংখ্যাগুরুর বিদ্যালয়ের জন্য যত সমস্ত নিয়ম! আজ এই স্কুলগুলোর সকলকে অপরাধীর মতো দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে, সংবিধানের 'freedom' এখানে কোথায়? যেখানে বিদ্যাভারতীর স্কুলগুলির ত্রুটি খুঁজে তা বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে

**বিদ্যাভারতী ধর্মীয় নয়, মানুষ গড়ার কাজে রত। আজ যাঁরা এই বিদ্যালয়গুলিকে কুদৃষ্টিতে দেখছেন, বন্ধ করে দেবার প্রয়াস করছেন, 'মানুষ' তৈরি হলে এদেরকে তো তাদেরও কাজে লাগবে, দেশের কাজে লাগবে। এই সুবুদ্ধিটুকু শাসকমহলের কবে আসবে সেই ভরসায় থাকতে হবে আমাদের।**

বা প্রয়াস চলছে, সেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ২০১১-তেই ঘোষণা করেছিলেন, ১০,০০০ (দশ হাজার) মাদ্রাসাকে সরকারি অনুদানসহ শীঘ্রাতিশীঘ্র অনুমোদন দেবেন ('The Hindu'/11.06.2011)। বিদ্যালয় চালাতে গেলে তার পরিকাঠামো অবশ্যই চাই। অবশ্যই আর টি ই আইন মানতে হবে। কিন্তু, তার মধ্যে প্রয়োজন নমনীয়তা। কারণ আর টি ই-র উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার প্রসার— শিক্ষা রুদ্ধ করা নয়। আর তা হওয়া উচিত ধর্ম, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে। আজ এসব বাধার জায়গাগুলিকে নিয়ে বোধহয় জরুরিভিত্তিক ভাবার সময় এসেছে। শিক্ষালয়ে আজ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের ছায়া অপসৃত হোক। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক। বিদ্যাভারতী ধর্মীয় নয়, এই মানুষ গড়ার কাজে রত। আজ যাঁরা এই বিদ্যালয়গুলিকে কুদৃষ্টিতে দেখছেন, বন্ধ করে দেবার প্রয়াস করছেন, 'মানুষ' তৈরি হলে এদেরকে তো তাদেরও কাজে লাগবে, দেশের কাজে লাগবে। এই সুবুদ্ধিটুকু শাসকমহলের কবে আসবে সেই ভরসায় থাকতে হবে আমাদের। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

# সিবিআই নয়, সচেতন গণ-আন্দোলনই পারে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের জন-বিচ্ছিন্ন করতে

কে. এন. মণ্ডল

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে— 'দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।' আর এই দুর্জনেরা যদি ক্ষমতাশালী হয় বা ক্ষমতাশালীদের দ্বারা আশ্রিত হয়, অথবা ক্ষমতাসীন দলের লোক হয়— তাহলে তো কথাই নেই। আইনরক্ষকরাই বিভিন্ন ছল-চাতুরির সাহায্যে তাদের রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হবে। বিচার ব্যবস্থা যতই নিরপেক্ষ হোক না কেন, রাজনৈতিক প্রভুদের পদলেহনের জন্য অভিযুক্তরা কখনোই বিচারের আওতায় আসবে না। কারণ বিচার ব্যবস্থা যতই শক্তিশালী হোক তাদের হাত-পা বাঁধা থাকে আইনের বেড়িতে। প্রমাণ ছাড়া অপরাধগ্রাহ্য কারণেও কিচ্ছুটি করার থাকে না। মেরুদণ্ডহীন প্রশাসনের চেষ্টা থাকে যাতে প্রভাবশালীরা বিচারের কাঠগড়ায় না পৌঁছন আর কোনো কারণে পৌঁছে গেলেও, তাদের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ যেন না মেল। সেই সুযোগে দুর্নীতিবাজরা রাজনীতির অলিন্দে বা সমাজজীবনে বুক ফুলিয়ে তাদের দাপট ও ক্ষমতার প্রদর্শন করে, অথচ এদের বাঁধাবুলি— 'আইন আইনের পথে চলবে'। আইনের প্রতি এতই যদি ভরসা, তাহলে আইনের পদ্ধতিকে ঠেকানোর জন্য কোষাগার থেকে জনগণের টাকা খরচ করা কেন? প্রশ্ন হলো, এর পরেও কেন মানুষের এই আড়ষ্টতা, কীসের ভয়ে মানুষ সিঁটিয়ে থাকে! গণতন্ত্রে মানুষই তো নিয়ামক শক্তি। একবার ভোট দিলেই সেই শক্তি খরচ হয়ে যায় না, সে শক্তিই গণতন্ত্রকে সঞ্চালিত রাখবে প্রতি পদে। তাহলে কি সৈয়দ মুস্তবা আলির বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সর্বত্র— 'নাঙ্গাসে খুদা ভি ডরতা হ্যায়'? আর এই ভয় বা ডর-ই কি তথাকথিত বিদ্বজ্জনকে পর্যন্ত চুপ করিয়ে দেয়? কেউ সরব হলেই মিথ্যা মামলা বা হাজতবাস। এই ছবি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদর্শিত হলেও, এর ঝলক অন্যান্য প্রদেশেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। অথচ আমরা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। অন্যদিকে, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দলমত নির্বিশেষে এক অদ্ভুত ঐকমত্য ইদানীং লক্ষিত হচ্ছে। দুর্নীতি এবং রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য। এটা জনমানসে প্রতিষ্ঠা করে তাদের দুর্নীতিকে সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করা— যা এক নিন্দনীয় প্রয়াস। আবার কেউ কেউ ক্ষমতার শিখরে বসেও, অন্যদের থেকে কম দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণার অঙ্গীকার কেউ করছেন না। ক্ষমতা ভোগের রাজনীতি— সাধারণের অলক্ষে এদের ভিতরে গড়াপেটা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

বঙ্গারু লক্ষ্মণ

উমা ভারতী

কেন এমন হলো? আমরা এই অবক্ষয়জনিত সমাজ ব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইনি। ভারতে বিদেশি শাসনকালেও দুর্নীতি আজকের মতো সর্বব্যাপী ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশনায়কেরা ত্যাগ ও মূল্যবোধের আদর্শ তাঁদের কাজের মাধ্যমে রেখেছেন। পরবর্তী প্রজন্ম তাতে উদ্দীপিত না হয়ে দুর্নীতিকে কেন সমাজ জীবনের অঙ্গ করে নিল, তা সমাজ-বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। তবে ইদানীংকালে সান্ধ্যকালীন টেলিভিশন বিশ্লেষণে বুদ্ধিজীবী তথা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় দুর্নীতির প্রশ্নে রক্ষণাত্মক হতে— আবার স্বদলীয় দুর্নীতির ক্ষেত্রে কুযুক্তির অবতারণা করতে— তাতে কিন্তু বর্তমান সমাজজীবনের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। আবার, নির্বাচনের সময় আর্থিক বা নৈতিক কারণে দাগি ও অভিযুক্তরা সরলপ্রাণ গরিব মানুষদের নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে, ভুল বুঝিয়ে কোনোভাবে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারলেই, বাল্মীকিমুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন গণ-আদালতে তাদের সব পাপমুক্তির জন্য।

এই গণ-আদালত কথাটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশেষ অর্থবহ। যদিও দুর্নীতিবাজরা তাদের অনুকূলে 'গণ-আদালত' কথাটির অপব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে সংবিধান প্রণেতাগণ জনগণের হাতে যে বিশাল দায়িত্ব এবং অধিকার অর্পণ করেছেন তা পালন করার শিক্ষা ও সচেতনতা কি আমাদের আছে? মনে

রাখতে হবে, একজন হতদরিদ্র নিরক্ষর-নিরাশ্রয় ফুটপাতবাসীর একটি ভোটের যে মূল্য--- ঠিক একই মূল্য ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর ভোটের। (উদাহরণটি দেওয়া হলো গণতান্ত্রিক ভারতের ভোটের চালচিত্র তুলে ধরার জন্য— কাউকে গরিমান্বিত বা হেয় করার জন্য নয়)। এই বিশাল দায়িত্বের কথা আমরা কি মনে রাখি আমাদের ভোট প্রয়োগের সময়? তাই যদি হোত, তাহলে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে— এমনকী আমাদের সমাজজীবনে কী করে দাপিয়ে বেড়ায় এই দুর্নীতিবাজরা? এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলিরই বা ভূমিকা কী? কী করছে নির্বাচন কমিশন? নির্বাচনের সময় তাদের নাকের ডগায় নানা ভাবে নির্বাচনবিধি ভঙ্গ করে ভোটারদের ভয় দেখায়— ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়— ক্ষমতাসীন দল নিরপেক্ষ অফিসারদের ভয় দেখায়--- মিডিয়ার দৌলতে সব কিছুই সবাই দেখতে পাচ্ছে— নির্বাচন কমিশন ছাড়া। একথা এ কারণে উল্লেখ্য যে কমিশন যদি ভোটপর্ব অবাধ করতে পারতো, তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিছুটা সফল রূপ নিত। 'ভারত সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' আমাদের এই গর্ব কি শুধুই প্রসহন? এর জবাব দিতে হবে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে।

ইদানীং নারদ কাণ্ডে যেমন পশ্চিমবঙ্গ আলোড়িত, তেমনি একযুগ আগে এই ম্যাথু সামুয়েলের String Operation-এর শিকার হয়েছিলেন সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি কর্ণাটকের বঙ্গারু লক্ষ্মণ। বিষয়টি মিডিয়ায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দল বঙ্গারুকে পার্টি সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করে এবং আদালতের বিচারে ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় লক্ষ্মণকে। দল তাঁকে আর ক্ষমতার অলিন্দে ফিরিয়ে আনেনি। শুধু কী তাই, অভিযোগের উপর ভিত্তি করে বিজেপি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী উমা ভারতীর মতো প্রভাবশালী নেত্রীকে পদ থেকে অপসারিত করে, পরে আদালত তাকে নির্দোষ রায় দেয়। দুর্নীতিগ্রস্ত বা দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এ ধরনের দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলে এবং তাতে দুর্নীতির প্রবণতা অবদমিত হয়। অথচ, আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা তৃণমূলদল নারদ কাণ্ডে অভিযুক্তদের জনগণের করের টাকা খরচা করে তাদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। উল্টে String Operation চালানোর অপরাধে স্যামুয়েলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করছে বিজেপির নাম যুক্ত করে। অথচ, এই স্যামুয়েলই তো বঙ্গারুকেও ফাঁসিয়েছিল। তাই, ম্যাথুর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না খুঁজে তাঁকে পুরস্কৃত করা উচিত দুর্নীতিবাজদের জনসমক্ষে আনার সাহসিকতার জন্য। বর্তমান নোংরা দুর্নীতিতে নিমজ্জ ভারতের রাজনৈতিক আবহে, জনজীবনকে পরিচ্ছন্ন করার প্রয়াস হিসেবে এধরনের Investigative Journalism-এর খুব প্রয়োজন। তা না হলে সৎ বিবেকবান মানুষ রাজনীতিতে আসবে না প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির আক্ষেপ সত্ত্বেও। প্রসঙ্গত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর উদ্ধৃতি দিয়ে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক আয়োজিত দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এক আলোচনা সভায় বলেছিলেন, 'অপরিচ্ছন্ন বলে বিশিষ্টরা যদি রাজনীতিতে আসার বিষয়টিকে অবজ্ঞা ভরে অবহেলা করেন— তাহলে সর্বাধিক যে মূল্য দিতে হয়, সেটি হচ্ছে নিকৃষ্টতর মানুষ কর্তৃক শাসিত হওয়া।'

তাই, আজ সময়ের দাবি— সমস্ত সৎ, শুভবুদ্ধি ও সাহসী নাগরিকরা দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসুন দুর্নীতিগ্রস্তদের সমাজ জীবন থেকে একঘরে করার প্রয়াসে। সাময়িক প্রলোভনে না ভুলে, ভারতমাতাকে তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিতে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রামে শামিল হতে হবে সমাজজীবনকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য, আর তাতেই হবে সামগ্রিক উন্নয়ন। সিবিআই ব্যাধির উপশম ঘটাতে পারে, নির্মূল করতে পারে না।

*(লেখক কে. এন. মণ্ডল ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ আধিকারিক)*

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,**
**যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬



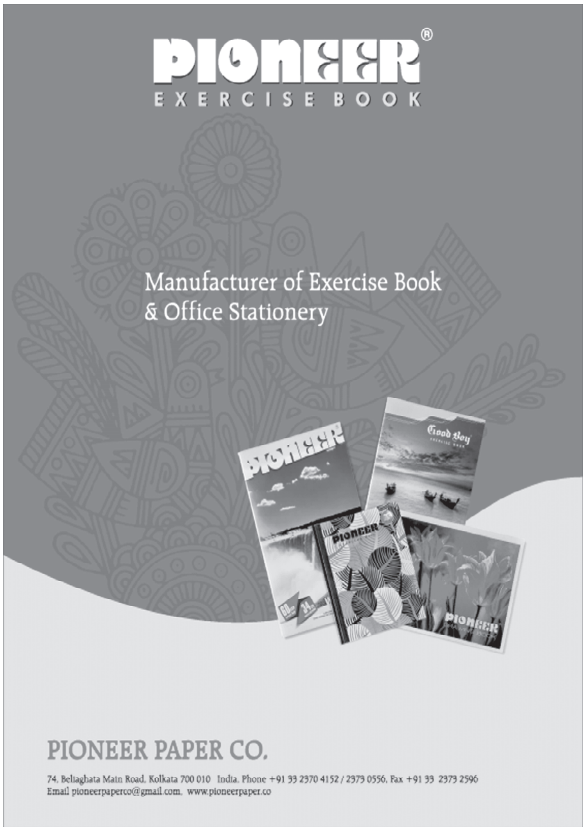

"ভারতে শত শত বৎসর ধরে এ রীতি প্রচলিত। আলো, পুষ্পসজ্জা, সুন্দর কার্পেট (শতরঞ্চি) এবং ধূপের গন্ধে ঘেরা পরিবেশে কিছু পাঠ, কিছু সঙ্গীত এবং কিছু কাহিনির মাধ্যমে কথক ঠাকুর তাঁর কথকতা পরিবেশন করেন। এ কথকতা যেন অনেকটা অভিনয়, উপদেশ ও সাহিত্যের সম্মিলিত সৃষ্টি।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

**সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী**

# সুকমায় অ্যাম্বুশের পর মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে নতুন ব্যবস্থা

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অ: প্রা:)

মাত্র কিছুকাল আগে ছত্তিশগড়ের সুকমা অঞ্চলে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্ব-সহ প্রায় চল্লিশজন সুরক্ষাকর্মীকে (সি আর পি এফ) মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করেছিল। তারপর প্রায়শই মশা মাছির মতো সুরক্ষাকর্মীদের তারা হত্যা করে চলেছে। মধ্যপ্রদেশের বস্তার অঞ্চল ঘন জঙ্গলাকীর্ণ, যেখানে হতদরিদ্র বনবাসীদের বসবাস। স্বাধীনতার পর বহু বছর কেটে গেলেও উন্নয়নের ছোঁয়াচ ওই অঞ্চলের মানুষের উপর আজও পড়েনি। নেই কোনো রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, নেই কোনো শিল্প ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ। জনজাতি মানুষের দাবি, তাদের জমির মালিকানা স্বত্ব দিতে হবে। সে বিষয়েও কোনো প্রগতি হয়নি।

কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) ওই অঞ্চলের দরিদ্র, পিছিয়ে থাকা মানুষের কল্যাণের জন্য উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে মানুষের হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। মধ্যপ্রদেশকে কেন্দ্র করে অন্তত দশটি রাজ্যে— মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা, তেলেঙ্গানা ও ছত্তিশগড়ে। কিন্তু সুকমা অঞ্চলেই সুরক্ষা কর্মীরা সবচাইতে অধিকসংখ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে। গত ১১ মার্চ এবং ২৪ এপ্রিল অন্তত ৩৭ জন সি আর পি এফ জওয়ান নিহত হন। সুকমা অঞ্চলে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুবই ঢিমেতালে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। ওই কাজে সুরক্ষা প্রদানের জন্য সি আর পি এফ কর্মীরা নির্মীয়মাণ রাস্তা ধরে কর্মস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎই তাদের উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি ছুটে আসতে থাকে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারা যায় প্রায় শ' তিনেক মাওবাদী জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সুরক্ষাকর্মীদের উপর অস্ত্র প্রহার করে। ওই রাস্তায় তারা আই ই ডি-ও পুঁতে রেখেছিল। তাদের মধ্যে বহু সংখ্যায় মহিলা সন্ত্রাসবাদীও অংশগ্রহণ করেছিল বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। কিন্তু আমার মনে হয় মাওবাদীরা গ্রামের নরনারী শিশু নির্বিশেষে সকলকে জড়ো করে ঢালের মতো ব্যবহার করেছিল এবং তাদের মধ্যেও পিছনে অস্ত্র নিয়ে তারা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। সেই কারণে সুরক্ষাকর্মীরা জবাবি অস্ত্র প্রয়োগ করতে অসমর্থ হয়েছে, তা করলে বহু সংখ্যায় সাধারণ নিরপরাধ মানুষ হতাহত হতেন।

অকুস্থলে না গিয়ে এবং ঘটনার সমস্ত বিবরণ না জেনেও কয়েকটি বিষয় খুবই পরিষ্কার। যেমন যে অঞ্চলে এতবার মাওবাদীরা অ্যাম্বুশ করে এত সুরক্ষা কর্মীকে নিহত করেছে, সেই অঞ্চলের গভীরে যাওয়ার সময় সামান্যতম সাবধানতাও গ্রহণ করা হয়নি। নীচুতলার যেসব কৌশল খুবই সাধারণভাবে প্লাটুন, কোম্পানিস্তরে গ্রহণ করা উচিত, যাকে বলা হয় মাইনর ট্যাকটিক্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ডান্ট, হাবিলদার স্তরে যা অনিবার্যভাবে করা উচিত তাও করা হয়নি বলেই আমার ধারণা। একইসঙ্গে সামান্যতম গোয়েন্দা তথ্যও সুরক্ষাকর্মীদের জন্য ৭৪ নং ব্যাটালিয়নে ছিল না বলেই আমার ধারণা। এ কথাটা না বলে পারলাম না কারণ এতগুলি দেশপ্রেমী জওয়ানের শহিদ হওয়া এবং এতশত পরিবারের হয়তো একমাত্র অন্নদাতার মৃত্যু বুকের ভিতরটা মুচড়ে দেয়। সহ্য করা যায় না। প্রশ্ন করতেই হয় যখন রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ হয়েছে তখন এত ঢিলেমি কেন? কেন দ্রুততার সঙ্গে ওই কাজটা সম্পন্ন করা হলো না? মাওবাদীরা জনজাতি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। অথচ যখন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সড়ক নির্মাণ করছেন, তখন সেই উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ করার জন্য মাওবাদীরা হত্যালীলার আশ্রয় নিয়েছে অর্থাৎ তারা উন্নয়ন চায় না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে আগ্রহী নয়। তারা চায় টাকা। ব্যাঙ্ক লুঠ করা টাকা, কোনো শিল্প ওই অঞ্চলে আসতে চাইলে তাদের কাছে ট্যাক্স আদায় করা টাকা। এসবের জন্য নরহত্যায়ও তাদের হাত কাঁপে না।

*মণিপুরে জওয়ানদের কনভয়ে মাওবাদী হামলা।*

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওবাদী সন্ত্রাসগ্রস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। তিনি সেই আলোচনা সভায় সমাধানের পথ বাতলেছেন। যোগ্য এবং জবরদস্ত অধিনায়কত্ব প্রয়োজন সুরক্ষাবাহিনীর সর্বস্তরে। বিশেষ করে দরকার মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর আক্রমণাত্মক অভিযান। যুদ্ধে জয়লাভের মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে সমস্ত সুরক্ষাবাহিনীর মধ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রতিটি রাজ্যে প্রয়োজনমতো সহযোগিতা করবে। তবে সন্ত্রাসবাদ দমনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। প্রশিক্ষণের সর্বস্তরে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি এবং কৌশল শেখাতে হবে। প্রযুক্তিগত অস্ত্র এবং বিভিন্ন যন্ত্র

সুকমায় নিহত জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ।

ব্যবহার করতে হবে। গোয়েন্দা তথ্য আহরণের জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন সবই করা হবে। প্রতিটি বাহিনীর কৌশলগত যোগ্যতা এবং সফলতার হিসাব রাখা হবে। প্রতিরক্ষা বহু বছর ধরে আমাদের পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, এখন থেকে আক্রমণই হবে সর্বস্তরে মূলমন্ত্র। আমাদের চিন্তাধারাই হবে আক্রমণাত্মক।

একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন এই যুদ্ধের খরচ প্রতিটি রাজ্যকেই বহন করতে হবে। এই বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁদের দাবি মাওবাদী সন্ত্রাস কোনো রাজ্যের বিরুদ্ধে নয়, এই সন্ত্রাস ভারতের বিরুদ্ধে। অতএব ভারত সরকারকেই এই আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় কোনো রাজ্যেরই ওই ব্যয়ভার গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। রাজনাথ সিংহ আরও বলেছেন, উপদ্রুত অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতেও দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় উপদ্রুত রাজ্যগুলির কী ধরনের আর্থিক ক্ষমতা আছে? কারণ এই সন্ত্রাসবাদ বন্দুকের জোরে দমন করা সম্ভব নয়। অঞ্চলের মানুষকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হবে। প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপদে বিপদে তাদের পাশে গিয়ে সুরক্ষাবাহিনী ও স্থানীয় সরকারি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দাঁড়াতে হবে। যাতে স্থানীয় মানুষ সুরক্ষাবাহিনী ও রাজনৈতিক কর্মীদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। এমনটা হলেই সন্ত্রাসবাদীরা গ্রাম থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হবে। আর এই যোগাযোগের মাধ্যমেই অভিযান করার মতো গোয়েন্দা তথ্য সুরক্ষা বাহিনীর কাছে পৌঁছবে। সন্ত্রাসবাদীরা সাধারণ ভীতসন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের মাথায় পিস্তল ধরে দেশদ্রোহিতার কাজে লাগাতে পারবে না। তাদের কাছ থেকে কর আদায়ও করতে পারবে না। এমনকী রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, চিকিৎসাকেন্দ্র নির্মাণ সুরক্ষা কর্মীদের দ্বারাই করাতে হবে। সুরক্ষাবাহিনীর চিকিৎসকদেরই গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে হবে। যখন গ্রামবাসীরা সুরক্ষাকর্মীদের বিশ্বাস করতে পারবেন, তাদের উপর নির্ভর করতে পারবেন, তখনই আসল জয়লাভ হবে। রাজ্যের কর্মচারীরা সেই সুযোগে উন্নয়নের কাজে হাত লাগাতে পারবেন। এমতাবস্থায় বহু মাও সন্ত্রাসবাদী আত্মসমর্পণ করে সরকারি সাহায্য গ্রহণ করে মানুষের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারবেন। সন্ত্রাসবাদীরা এই পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে আবার আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে, সেই সুযোগে সুরক্ষাবাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের উপর কঠোর আঘাত হানার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে মাওবাদী নেতৃত্বের উপর । যেসব অঞ্চল শান্ত হয়ে আসবে, সেখান থেকে সুরক্ষাকর্মীদের সরিয়ে যেখানে মাওবাদীরা তখনও উপদ্রব চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে হবে।

এমন একটা সময় আসবে যখন সন্ত্রাসবাদীরা ভয় দেখিয়ে অথবা অর্থের লোভ দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের সন্ত্রাসবাদীদলে নাম লেখাতে পারবে না। গ্রামের মানুষ সন্ত্রাসবাদীদের তাদের গ্রামে অথবা তাদের গৃহে আসা-যাওয়া করতে বারণ করবে। তবে গ্রামের মানুষের সঙ্গে সুরক্ষাকর্মীদের সুব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের সম্মান করতে হবে। অঞ্চলের মানুষ বিপদে পড়লে, যেমন বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও তাদের বাঁচাবার প্রয়াস করতে হবে। যেমন ভাবে কাশ্মীরে সেনাবাহিনী বন্যার সময় সাধারণ মানুষকে বাঁচাবার প্রয়াস করেছিল। কিন্তু এই সমাজসেবা মাওবাদী অঞ্চলেই বেশি ফলপ্রসূ হবে। কিন্তু যেখানে পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্র উপদ্রুত অঞ্চলের সঙ্গে এক সীমান্তে রয়েছে, সেই সব অঞ্চলে ফললাভ সহজে হবে না। এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে হবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে কঠোর জবাব দিতে হবে এবং বিশ্বস্তরে চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

মাওবাদী উপদ্রুত অঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্যের সীমানায় কঠোর নজরদারি রাখতে হবে যাতে এক রাজ্যে সুরক্ষাকর্মীরা, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করার পর মাওবাদীরা অন্যরাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবেই ব্যবহার করতে হবে।

সবশেষে একটা বিষয় নিশ্চিত করতে হবে যাতে মাওবাদীরা সুরক্ষাকর্মীদের এখনকার মতো দলে দলে হত্যা করতে না পারে। এমন হলে সুরক্ষাকর্মীদের মনোবল ও গ্রামবাসীদের মনোবল যেমন ভেঙে যাবে, উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে, তেমনি মাওবাদীদের সাহস অনেকগুণ বেড়ে যাবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমাধানকে ভুললে চলবে না। মাওবাদী উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়ন আনতেই হবে। এটাই যেন হয় আমাদের প্রতিজ্ঞা। ■

# কিশোরবাহিনী গড়তে শিশু অপহরণ মাওবাদীদের

চন্দ্রভানু ঘোষাল

এ যেন নতুন এক বক রাক্ষসের গল্প। মহাভারতের বকরাক্ষস শর্ত দিয়েছিল প্রতিদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য গ্রামবাসীরা তার কাছে একজন করে মানুষ পাঠাবে। ঝাড়খণ্ডের লাতেহার, লোহারডাগা, গুমলা অঞ্চলের মানুষও এই মুহূর্তে নতুন এক বক রাক্ষসের শিকার। একবিংশ শতাব্দীতে এই বক রাক্ষস মাওবাদী নামে পরিচিত। ঝাড়খণ্ডের প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের অভিযোগ, কিশোর- কিশোরীদের তো বটেই, মাওবাদীরা ৬-৭ বছরের শিশুদেরও রেহাই দিচ্ছে না। বাবা-মার চোখের সামনে জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য যোদ্ধা তৈরি করে দেশবিরোধী যুদ্ধে শামিল করা। শিকার যদি মেয়ে হয় তাহলে তার ভবিতব্য যৌনদাসী হওয়া।

লাচ্চুর কথাই ধরা যাক। অতীতের সেই অভিশপ্ত দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখনও শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় ষোল বছরের লাচ্চুর। এখন ওরা রাঁচিতে থাকে। আগে থাকত সিংভূমে। তখন সে ক্লাস ফাইভের ছাত্র। বাড়িতে বাবা-মা ছাড়াও কয়েকটি ছোট ছোট ভাইবোন। একেবারে হতদরিদ্র দশা। একদিন পশ্চিম সিংভূমের টুটিকেট থেকে মাওবাদীরা তাকে অপহরণ করল। তাকে এবং তার মতো আরও কয়েকটি শিশুকে রুটমার্চ করিয়ে নিয়ে চলল সারাণ্ডার গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। পরদিন সকালে লাচ্চু আবিষ্কার করল তারা গিয়ে পৌঁছেছে এক মাওবাদী জঙ্গি শিবিরে। সেখানে কালো পোশাক পরা জঙ্গিরা এবং প্রায় জনাতিরিশেক হাফ-জঙ্গি মার্কা লোক তাকে বলেছিল, সারা পৃথিবীতে অচিরেই এক রক্তক্ষয়ী শ্রেণীযুদ্ধ শুরু হবে। শহরের পুঁজিপতিরা গ্রামের গরিবগুর্বো লোকেদের শোষণ করছে। মুক্তির একমাত্র উপায় সশস্ত্র সংগ্রাম— যা শুধু মাওবাদীরাই করতে পারে। আসন্ন সেই বিপ্লবের জন্য লাচ্চুর মতো শিশুদের মাওবাদী গেরিলা যোদ্ধা হতে হবে। শিখতে হবে বন্দুক চালানোর কৌশল, গ্রেনেড বিছানোর নিয়ম এবং সর্বোপরি শত্রুকে হত্যা করার ব্যাপারে হতে হবে নির্মম। কোনো কোনো জেলায় মাওবাদীরা নিয়ম করে দিয়েছে প্রত্যেক গ্রাম থেকে অন্তত পাঁচটি করে শিশু বাধ্যতামূলকভাবে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। অন্যথায় মৃত্যু। লোহারডাগার কাটারি গ্রামের মানিয়া বলে, 'গ্রামে পুলিশ আসতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। এক-এক সময় তো সারাদিনেও দেখা মেলে না। অন্যদিকে মাওবাদীরা সবসময় কাছাকাছি থাকে। ওদের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।' উল্লেখ্য, মানিয়া দু' বছর মাওবাদী স্কোয়াডে ছিল। অপহৃত শিশুদের ব্যাপারে মাওবাদীরা নির্দয়। দূরদূরান্তের গভীর জঙ্গলে তাদের নিয়ে গিয়ে একটু একটু করে ফেরার সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। লাচ্চু বলে,'বাড়ির কথা মনে পড়তে পারে এমন কোনো কিছু সঙ্গে রাখা যাবে না। বাবা-মা, ভাইবোনের ছবিও না।' পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লে ভয়ঙ্কর শাস্তি জোটে।

মাওবাদীরা যত শিশু অপহরণ করে তাদের একটা বড়ো অংশ মেয়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সাম্যে বিশ্বাসী মাওবাদীদের কাছে মেয়েরা নিরাপদ নয়। কিছুদিন আগে ঝাড়খণ্ড পুলিশ রাঁচি থেকে কয়েক ডজন মেয়েকে উদ্ধার করেছিল। তারা স্বীকার করেছে মাওবাদী শিবিরে থাকার সময় কমরেডরা তাদের ওপর অকথ্য যৌন নির্যাতন করত। এমনই একটি মেয়ে ষোল বছরের তারা। দু' বছর আগে তাকে তুলে নিয়ে যাবার সময় মাওবাদীরা তার বাবাকে বলেছিল তারা তার মেয়েকে একজন কমরেড বানিয়ে দেবে। পুলিশ যখন তাকে উদ্ধার করে তখন সে তিন মাসের অন্তঃসত্তা।

বক রাক্ষসের অত্যাচারে গোটা ঝাড়খণ্ড এখন দিশেহারা। বিশেষ করে যাদের বাড়িতে শিশু রয়েছে সেইসব বাবা-মা'র অবস্থা খুবই করুণ। পুলিশের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী এই মুহূর্তে মাওবাদী শিবিরে ২০০টির মতো শিশু রয়েছে। এদের বয়েস ছয় থেকে শুরু। কাজ সংবাদ আদানপ্রদান রান্নাবান্না থেকে শুরু করে মাইন বিছানো এবং নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে লড়াই করা পর্যন্ত বিস্তৃত। মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনা শিশুকে মরতে পাঠিয়ে কোন বিপ্লব হবে তা মাওবাদী নেতারাই বলতে পারেন। তবে ঝাড়খণ্ডের মানুষ একটা কথা ক্রমশ বুঝতে পারছেন মাওবাদীরাও ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের মতো উদ্বায়ী, শেকড়হীন একটা প্রজাতি। লাল রঙের আড়ালে রক্তের কারবারি। মানুষ এবং মানবিকতার আত্মজন মোটেই নয়।

# রক্তমাখা রাজনীতির প্রতিরোধের সময় এসেছে

অভিমন্যু গুহ

মার্কিন সরকারি বিভাগের সঙ্গে ন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম ফর দ্য স্টাডি অব টেররিজম অ্যান্ড রেসপন্স টু টেররিজম নামে একটি সংস্থা ২০১৫ সালে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছে এই বছর সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী হানার সংখ্যা ১১ হাজার ৭৭৪টি। এর ফলে মারা গিয়েছে ২৮ হাজার ৩২৮ জন এবং আহত হয়েছেন ৩৫ হাজার ৩২০ জন। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরের বছরই দেখা যায় এই তালিকায় ভারত চতুর্থ স্থানে। ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের পরই। ওই বছর ভারতে ৭৯১টি সন্ত্রাসবাদী হানার ঘটনা ঘটে। যার মধ্যে ৪৩ শতাংশই মাওবাদীরা ঘটিয়েছে। প্রায় তিনশো ভারতীয় নাগরিককে সবমিলিয়ে এর জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে। সিপিআই (মাওবাদী)-রা ২০১৫-তে ৩৪৩টি হামলা চালায়। যার জন্য প্রাণহানির সংখ্যা ১৭৬। শতাংশের বিচারে ভারতে চারটি সর্বোচ্চ জঙ্গি হামলা-প্রবণ রাজ্য হলো— ছত্তিশগড় (২১ শতাংশ), মণিপুর (১২ শতাংশ), জম্মু-কাশ্মীর (১১ শতাংশ) ও ঝাড়খণ্ড (১০ শতাংশ)। এর মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর বাদ দিলে বাকি তিনটি রাজ্যই মাওবাদী-অধ্যুষিত।

মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরের বছরই দেখা যায় যে ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যে মাওবাদী হামলার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। ২০১৪ সালে যেখানে ৭৬টি হামলা ঘটেছিল ওই রাজ্যে, ২০১৫ সালে সেখানে মাওবাদী নৃশংসতা ঘটেছে ১৭৫টি ক্ষেত্রে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন সাম্প্রতিক অতীতে এনডিএ যখনই ক্ষমতায় এসেছে, তখনই যেমন ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়েছে পাকিস্তান; ঠিক একইভাবে মাওবাদীরাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। এইবার এই মরিয়া ভাবটা আরও বেশি দেখা যাচ্ছে। কারণ মোদী সরকারের আর্থিক ক্ষমতায়ণ কর্মসূচি। অর্থনীতিবিদদের মতে, নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পরে একঘেয়ে ক্লিশে হয়ে যাওয়া দারিদ্র্য-দূরীকরণ কর্মসূচির মধ্যেই কেবল নিজেকে আটকে রাখেননি। বরং সমৃদ্ধ ভারত সমর্থ ভারতের লক্ষ্যে তিনি জোর দিয়েছেন আর্থিক ক্ষমতায়ণের ওপর। যাতে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট করতে পারেন। সরকারের এই কর্মসূচির জেরেই মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষ আর্থিক নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ফলে মাওবাদীরা ক্রমশ পায়ের তলায় মাটি হারাচ্ছিল। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে মাওবাদীদের ভাঁড়ারেও টান পড়ে। তাছাড়া মাও দমনে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যে দৃঢ় পদক্ষেপ করেছে তার ফলেও এদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। সবমিলিয়ে এই মরিয়াভাব থেকেই মাওবাদীরা ছত্তিশগড়ে উপর্যুপরি হামলা চালাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই হামলার পেছনে চীনের মদত সন্দেহাতীতভাবেই রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ করার পরও চীন বিশেষ কল্কে পায়নি। তাদের স্বাভাবিক মিত্র পাকিস্তানের ওপর জঙ্গি দমনে কঠোর হওয়ার চাপও ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে তাদের দেশে ডেকে 'চিকেন নেক' অঞ্চল-সহ রাজ্যের অন্যত্র অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দখল নেওয়ার সুযোগও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ়তায়

## সাম্প্রতিক সুকমায় কয়েকটি মাওবাদী আক্রমণ

- ২৬ আগস্ট, ২০১৬ : গুরুতর জখম ১।
- ৬ নভেম্বর, ২০১৬ : জখম ১।
- ২১ নভেম্বর, ২০১৬ : গুরুতর জখম ২।
- ২২ নভেম্বর, ২০১৬ : নিহত ১, আহত ১।
- ৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ : আহত ১।
- ১১ মার্চ, ২০১৭ : নিহত ১২, আহত ২।
- ২৪ এপ্রিল, ২০১৭ : নিহত মোট ২৬, আহত ৬।

ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ভেস্তে গিয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতকে অশান্ত করতে চীনেরও ভরসা তাই মাওবাদীরা। ২০১৪ ও ২০১৫ সালের দুটি পরিসংখ্যান পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যাবে যে মোদী সরকারকে তাদের বর্ষপূর্তির মধ্যেই মাওবাদীরা কতটা বিপজ্জনক বলে মনে করেছে। ২০১৫-তে ভারতে যতগুলি সন্ত্রাসবাদী হামলা সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে ৪৩ শতাংশই মাওবাদীরা ঘটিয়েছে। ২০১৪ সালে অপহরণের সংখ্যা ছিল যেখানে ৩০৫, ২০১৫-তে এই সংখ্যাটাই একলাফে বেড়ে দাঁড়ায় ৮৬২-তে। এর মধ্যে মাওবাদীদের দ্বারা অপহৃতের সংখ্যাই হলো ৭০৭। ২০১৪-য় এই সংখ্যাটা ছিল ১৬৩। ২০১৪-য় এতগুলো অপহরণ মাওবাদীরা করলেও কিন্তু অপহরণের সময় বড় কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি। ২০১৫-তে যেখানে সাতটি এধরনের ঘটনা ঘটেছে। মাওবাদীদের এই হামলা বিনা পরিকল্পনায় হচ্ছে না। বরং এর পেছনে আন্তর্জাতিক সু-পরিকল্পনারই ইন্ধন মিলেছে। ২০১৪-য় নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর দেশের উন্নতিতে যেভাবে প্রতিটি ভারতবাসীকে শামিল করতে পেরেছিলেন,

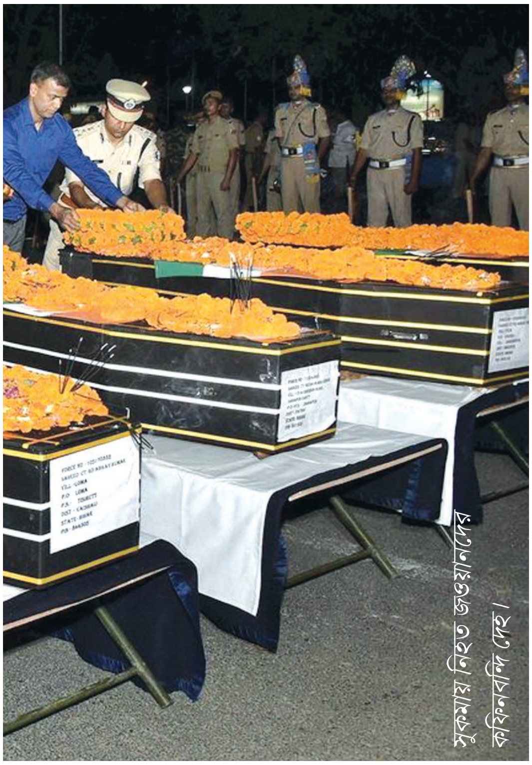
সুকমায় নিহত জওয়ানদের কফিনবন্দি দেহ।

আন্তর্জাতিক স্তরেও যেভাবে ভারতকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাতে প্রমাদ গোনে চীন-পাকিস্তান। ২০১৫ সালে মাওবাদীদের দিয়ে বেপরোয়া আক্রমণ চালানোর পরের বছরই অর্থাৎ ২০১৬-র গোড়ায় তাদের পেটোয়া দেশদ্রোহী বুদ্ধিজীবীদের মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়। জে এন ইউ-য়ে আফজল গুরুর শোকসভা পালনকে কেন্দ্র করে দেশকে অশান্ত করার ছক আজ প্রত্যেকেরই জানা। এভাবেই চীন-পাকপন্থী বুদ্ধিজীবীরা গত বছর জুড়ে ভারতবিরোধী একের পর এক চক্রান্তে শামিল হয়েছে।

প্রাক্তন সেনা-গোয়েন্দা অফিসার এবং 'র'-এর আধিকারিক আর এস এন সিংহ তাঁর লেখা সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে জেহাদি ও মাওবাদী আদর্শের ঐক্য খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য মাওবাদী আঁতেলরা জে এন ইউ, যাদবপুরে এতদিন 'ভারত তেরি টুকরে হোঙ্গে', 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি'র মতো স্লোগান তুলেছে। আজ এরাই 'বস্তার মাঙ্গে আজাদি'র ধুয়ো তুলছে। এবং এরই ফলে কুপওয়ারা কিংবা বস্তার রক্তাক্ত হচ্ছে।

ইউরোপিয়ান শিক্ষাবিদ স্টিফেন কোর্টিস তাঁর 'ব্ল্যাক বুক অব কমিউনিজম : ক্রাইমস, টেরর, রিপ্রেসন' (ফ্রান্স, ১৯৯৭) বইতে কমিউনিস্টদের মানুষ মারার রাজনীতির কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে চীনে সাড়ে ৬ কোটি, সোভিয়েত ইউনিয়নে ২ কোটি, কম্বোডিয়ায় ২০ লক্ষ, উত্তর কোরিয়ায় ২০ লক্ষ, ইথিওপিয়ায় ১৭ লক্ষ, আফগানিস্তানে ১৫ লক্ষ, ভিয়েতনামে ১ লক্ষ, লাতিন আমেরিকায় দেড় লক্ষ মানুষকে মেরেছে কমিউনিস্টরা। এছাড়া আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেখানে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় নেই সেখানেও অন্তত দশ হাজার নিরীহ মানুষকে মেরেছে তারা। এর মধ্যে ভারতীয়রাও আছেন।

১৯৯৭ সাল পর্যন্ত গৃহীত এই তথ্যে যে এরপর আরও বহু মানুষের মৃত্যু সংযোজিত হয়েছে তা দেখাই যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বোধহয় ভারত। কারণ এখানে একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম ও কিছু ধান্দাসর্বস্ব লোক বুদ্ধিজীবী তকমা ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত দুর্বুদ্ধি জুগিয়ে চলেছে মাওবাদীদের। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় কমিউনিজমের মুখোশ খুলে দিয়েছেন বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ রুমেল। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন কমিউনিজমের দুই মুক্তাঞ্চল চীন ও রাশিয়ায় সরকারের দ্বারা ২১২ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কমিউনিস্ট জমানাতেই নিহতের সংখ্যা ১৪৮ কোটি। অথচ ভারতে এখনও কিছু লোক এই রক্তমাখা আদর্শে নাকের জল চোখের জল এক করে ফেলেন। মোদীর আমলে এদের মুখোশটা খুলে গিয়েছে। দেশবাসীর কাছে অপাংক্তেয় এই সম্প্রদায় এখন দেশের মানুষকেই মারার ছক কষছে। এদের পরামর্শদাতা ও সমর্থনকারীরা 'বুদ্ধিজীবী' ট্যাগ ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদেরও টেনে নামানোর সময় হয়েছে। ■

# শালবাড়িতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠান

গত ৭ মে সকাল ১১টায় শিলিগুড়ির নিকটস্থ শালবাড়ির বহুমুখী উন্নয়ন প্রজেক্ট চত্বরে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, উত্তরবঙ্গ আয়োজিত নবম বার্ষিক সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কৃপাপ্রসাদ সিংহ বলেন, প্রয়াত অশোক সিংহল (প্রাক্তন সভাপতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ) গান লিখেছিলেন, 'জো ভাই ভুলে বিছড়ে— হাথ পকড় লে সাথ চলেঁ।' সেই উদ্দেশ্যেই এক উজ্জ্বল ভারত নির্মাণের জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রম কাজ করে চলেছে। বৈদিক রীতি-নীতির অনুসারী বনবাসী সমাজে বিবাহের জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকার কারণে বিবাহ অনুষ্ঠান ছাড়াই দম্পতি হিসেবে সংসারধর্ম পালন করেন। সমাজের সহযোগিতায় এদিন ১০১ জোড়া

দম্পতি বৈদিক রীতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। কৃপাপ্রসাদজী সকলের দীর্ঘায়ু ও সুখী সমৃদ্ধ জীবনের জন্য ভগবান ও দেবতাদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। শহরবাসীদের নিত্যনিয়মিত সহযোগিতা আসছে। যোগাযোগ বাড়ছে। এখন আর কেউ আমাদের একজনও বনবাসী বা জনজাতি ভাইকে আলাদা করতে পারবে না বলে কৃপাপ্রসাদজী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এদিন শালবাড়িতে বিরাট প্যান্ডেলে ২৫টি ছাঁদনাতলায় প্রভাতফেরির পরে দম্পতি-সহ সকলে সমবেত হন। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণে বিবাহকার্য সমাধা করেন। নবরূপে দম্পতিদের সবাই আশীর্বাদ জানান। নিমন্ত্রিত ও রবাহুতদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম নয়। উদ্যোক্তরা ভাত, ডাল, সবজি, চাটনি ও দু'রকম মিষ্টির ব্যবস্থা করেন। কল্যাণ আশ্রমের সর্বভারতীয় ক্রীড়া প্রমুখ শক্তিপদ ঠাকুর আশীর্বচন দান করেন। সভা পরিচালনা করেন কমলজী পুগলিয়া (সম্পাদক)। ধন্যবাদ জানান রাজ্য (উত্তরবঙ্গ) সভাপতি সুশীল বেরেলিয়া।

## পরিবার প্রবোধনের প্রাদেশিক বৈঠক

গত ১ মে সারাদিন মানিকতলাস্থিত ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কার্যালয় 'নরেশ ভবনে' পরিবার প্রবোধনের প্রথম প্রাদেশিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রদেশের ৭টি জেলা থেকে ৫ জন মহিলা কার্যকর্ত্রী-সহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে গত এক বছরে প্রতিটি জেলার কাজের বৃত্ত নিবেদন এবং আগামী ছয় মাসের জন্য কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বৈঠকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সমাজের অবক্ষয়ের দিনে পরিবার প্রবোধনের কাজের প্রয়োজনীয়তা তিনি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র।

# এই সময়

## মৈত্রীর বদলে

আন্টার্কটিকায় ভারতের স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রের নাম মৈত্রী। তার বয়েস আঠাশ

পেরিয়েছে। ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব মাধবন নায়ার রাজীবন জানিয়েছেন, মৈত্রীর জায়গায় অন্য একটি স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। যাতায়াতের সুবিধার্থে কেনা হবে জাহাজও।

## নুনের গুণ

এতদিন শোনা যেত বেশি নুন খেলে জলপিপাসা বেড়ে যায়, রক্তও পাতলা হয়ে

যেতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার গবেষকেরা জানিয়েছেন নুন বেশি খেলে এসব কিছুই হয় না। বরং নুন বেশি খেলে খিদে বাড়ে, ওজনও কমে।

## দেবদূত

দিল্লির অরুণকুমারের জীবনের লক্ষ্যই হলো পথ হারানো শিশুদের বাবা-মা-র কাছে

ফিরিয়ে দেওয়া। এখনও পর্যন্ত ৩৩টি শিশুকে তিনি উদ্ধার করেছেন। পেশায় অটোচালক মানুষটি জানিয়েছেন, পথহারানো কোনো শিশু দৈবাৎ তার অটোয় উঠলে তিনি তার মুখ দেখে সব বুঝতে পারেন।

## এই সময়

### বাবার মন

তার নাম ইদ্রিশ আলি। পেশায় ঝাড়ুদার। পাছে মেয়েরা বাবার পরিচয় দিতে লজ্জা পায় তাই কোনোদিন বাড়িতে কী কাজ করেন বলেননি। রাস্তার কলে স্নান করে বাড়িতে ফিরতেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে খবরটি।

### শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

মেয়েরা এখন ফাইটার প্লেন চালাচ্ছেন। গত বছর বায়ুসেনা পাইলট পদে মেয়েদের নেওয়া

শুরু করেছে। পাইলট হতে ইচ্ছুক মেয়েদের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। উৎসাহিত বায়ুসেনা কর্তৃপক্ষ একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে। নাম, ম্যায় এক লেড়কি হুঁ। যার সারমর্ম উও লেড়কি যো ঘর বানাতি হ্যায় আভি ঘর বাচায়েগি।

### উল্টো চড়াই

হরিয়ানার মুকেশকুমার গাছে চড়তে ভালোবাসেন। কিন্তু উল্টো করে। অর্থাৎ মাথা থাকবে নীচে আর পা ওপরে। অনেকবার আহত হয়েছেন, পড়ে গেছেন। কিন্তু তাকে থামায় কার সাধ্যি! না,

গিনিস বুক অব রেকর্ডসে জায়গা পাওয়ার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই। এটা বলতে পারেন স্রেফ শখ।

## সমাবেশ -সমাচার

# সিকিম বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৮, ৯ ও ১০ মে সিকিম বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে সিকিমের পকংয়ে বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে 'মহাত্মা বুদ্ধ কথা'র আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভগবান বুদ্ধের জীবনকথা ব্যাখ্যা করেন দ্য ওয়ার্ল্ড হিন্দু-বৌদ্ধ কালচারাল ফাউন্ডেশনের সন্ন্যাসী গোবিন্দ গিরি

মহারাজ। সিকিম, শিলিগুড়ি, গ্যাংটক এবং আশপাশের ২০টি গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ 'বুদ্ধ কথা' শুনতে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ কার্যকর্তা বালকৃষ্ণ নায়েক, জগন্নাথ শাহু, সঞ্জীবজী। এছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিদেশ বিভাগের কার্যকর্তা হরতালকরজী, সিকিমের সভাপতি সিপি গিরি, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ধাকলজী প্রমুখ।

## শ্রদ্ধার ৮৬তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৯ এপ্রিল সিউড়ী নগরের সেহাড়াপাড়া অধিবাসী বিশ্বনাথ মিশ্রকে তাঁরই ভদ্রাসনে শ্রদ্ধার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তিনবার ওঙ্কারধ্বনি ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক পূজ্য স্বামী সত্যানন্দপুরী মহারাজ। মিশ্রমশাইকে তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ শ্রীমতী চৈতালী মিশ্র হস্তপদ ধুইয়ে চন্দন, ফুল, তুলসীপত্র দিয়ে পূজন করেন। মানপত্র পাঠ করেন মাধাইপুর

উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বীরভূম জেলার সরস্বতী শিশু মন্দির সমিতির জেলা সভাপতি শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রী মিশ্রকে অর্ঘ্যস্বরূপ গীতা, পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয়, ফল ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রদ্ধার সহ-সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায় ও জীবন মুখোপাধ্যায়। পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন পুত্রবধূ শিক্ষিকা শ্রীমতী চৈতালী মিশ্র। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে শ্রদ্ধার এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন 'শ্রদ্ধা'র অনুদানী ও সিউড়ী বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নিবেদিতা মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন সিউড়ী বেণীমাধব উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

# এই সময়

## রবিনহুডগিরি

বাবা-মা-র জুতো কিনে দেবার টাকা নেই। তাই পাঁচ বছরের বোনের জন্য জুতো চুরি করল দিদি। তাকে সাহায্য করলেন এক পুলিশ অফিসার। অফিসার চে মিলটন গিয়েছিলেন পিৎজা কিনতে। সেখানে মেয়েটিকে চুরি করতে দেখেন। পরে সব শুনে হাত বাড়িয়ে দেন সাহায্যের। ঘটনাটি ঘটেছে আটলান্টায়।

## মিষ্টিমুখ

দেশ বিপদে পড়লে দেশের মানুষ একজোট হয়। আবার সেই বিপদ কেটে গেলে আনন্দও

করে এক সঙ্গে। কুলভূষণ যাদবের ফাঁসির আদেশে স্থগিতাদেশ জারি হওয়া মাত্র মুম্বইয়ের লোয়ার প্যারেল স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলের ধাবাওয়ালারা পথচারীদের মিষ্টি বিতরণ করলেন। আনন্দের দিনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও দেখান ধাবাওয়ালারা।

## পেইনকিলারে সাবধান

সামান্য মাথার যন্ত্রণা হলেও অনেকে মুড়িমুড়কির মতো পেইনকিলার খান। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের একটি গবেষণামূলক

প্রবন্ধ থেকে জানা গেছে যন্ত্রণা কমাতে গিয়ে পেইনকিলার হার্টের মারাত্মক ক্ষতি করে। হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে যে-কোনো সময়।

**সমাবেশ -সমাচার**

# পরলোকে ড. প্রীতিমাধব রায়

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর নিবাসী স্বনামধন্য ড. প্রীতিমাধব রায় গত ১২ এপ্রিল স্বগৃহে ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সাধারণ ভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ড. রায় মৃত্যুর কিছুদিন আগে বার্ধক্যজনিত কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন। বিপত্নীক ড. রায় একপুত্র, দুই কন্যা, নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ইতিহাসে এম.এ এবং পি এইচ ডি করার পর ডব্লিউ বি সি এস আধিকারিক রূপে ড. রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থেকে যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্বপালন করেছেন। একজন সৎ, পরিশ্রমী এবং দক্ষ আধিকারিক রূপে তিনি সহকর্মী এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

সরকারি আধিকারিক থাকার সময় তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদে যোগ দেন। রাজ্য সহ-সভাপতি ও সম্পাদক রূপে তিনি ব্যাপকভাবে সমগ্র রাজ্য পরিভ্রমণ করে পরিষদের কাজকে প্রসারিত এবং দৃঢ়বদ্ধ করেন। রামজন্মভূমি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর কুশল নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য।

প্রখর হিন্দুত্ববোধ সম্পন্ন ড. রায় আমৃত্যু হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। বিভিন্ন সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান-সহ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

পুস্তক প্রণেতা ড. রায় গ্রন্থরচনায় তাঁর সমৃদ্ধ চিন্তা, সচেতনতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনায়াস পারঙ্গমতার পরিচয় রেখে গেছেন। রাষ্ট্রচিন্তা, স্থানীয় ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে লেখা বইগুলি দেশ, জাতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম বিষয়ে পাঠককে আগ্রহী করে তোলে। জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে, অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের ফসল স্বরূপ তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ধর্মময় ভারত'। যাতে ভারতে উদ্ভূত ধর্মমতগুলির উৎস, বিকাশ, বিস্তার নিয়ে সরল ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা বইটিকে আকর গ্রন্থের তালিকায় স্থান করে দিয়েছে।

মননশীল এবং সুলেখক ড. রায় স্বস্তিকা-সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখার কাজে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে স্বস্তিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর রচিত প্রবন্ধ, আলোচনা ইত্যাদি পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। এই ঈশ্বরনিষ্ঠ, কর্মঠ ব্যক্তির বিদেহী আত্মা শ্রীভগবৎ চরণে চিরশান্তি লাভ করুক এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই বিয়োগজনিত দুঃখ সহনের শক্তি শ্রীভগবান প্রদান করুন— এই প্রার্থনা করি।

## শোকসংবাদ

উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া ভারতীর সহ-সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ বর্মনের মাতৃদেবী চিন্তামণি বর্মন গত ৫ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

# মোদীর জনপ্রিয়তাই আজ যে-কোনো নির্বাচনের নির্ণায়ক শক্তি

## অতিথি কলম

আরতি জিরাত

২০১৪ সালে কংগ্রেস সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি ও ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার কারণে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি মোদীর জয়ের ক্ষেত্রে যতটা ক্রিয়াশীল ছিল, সাম্প্রতিক উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী বিজয় দেখাল প্রথম জয়টি মোটেই কোনো ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ নয়। ২০১৪-র নির্বাচনে ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদী নামের কোনো অভাবনীয় ব্যক্তিত্বের যদি উদয় হয়ে থাকে সাম্প্রতিক জয়টি তাঁকে ধরাছোঁয়ার বাইরে অবিমিশ্র জনপ্রিয়তার নতুন শিখরে নিয়ে গেল। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো তিনিই ভারতীয় রাজনীতির অবিশ্বাস্য চালিকাশক্তি। কারুর পছন্দ হোক বা না হোক একথা হলফ করে বলা যায়— তিনি এই শীর্ষস্থান ২০১৯ অবধি তো বটেই তার পরেও দখল করে থাকবেন। অনেকটা ইন্দিরা গান্ধীর সময় যেমন ছিল। ভারতবর্ষের রাজনীতি এখন মোদীকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। তিনিই হবেন কেন্দ্রবিন্দু।

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে যে তুমুল জনপ্রিয়তার তুফান তুলে তিনি কেন্দ্র দখল করেছিলেন, এতটা সময়ের পরেও সেই জনপ্রিয়তার পারদ আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ২০১৪-র মতো ২০১৭-র জয়ও সর্বাত্মক। এই তরঙ্গমালার অভিঘাত যেমন পড়শী উত্তরাখণ্ডে পড়েছে তেমনি সুদূর উত্তরপূর্বের মণিপুর যেখানে বিজেপির কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না তাও তাদের অধিকারে এসেছে। এই জয় ২০১৫ সালে রাজনৈতিক বালখিল্য আপ ও বিহারে নীতীশ কুমার-লালুর অসম জোটের বিরুদ্ধে পরাজয়ের খোঁচায় পর্যাপ্ত শান্তিবারি বর্ষণ করবে এমনটা বলা যায়। কোনো কোনো বিশ্লেষক যেমন বলছেন, মোদীর নির্বাচনী ভাষণে কবরস্থান-শ্মশানের অনুষঙ্গ টেনে আনার মাধ্যমে মেরুকরণের রাজনীতির কারণেই এই সাফল্য। এটি মোদীর রাজনৈতিক দক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মূর্খামির পরিচয় হবে। মোদী কোনোসময়ই তাঁর 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' নামক অর্পিত অভিধাকে অঙ্গীকার করার কথা বলেননি। প্রথমে গুজরাট ও পরে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তিনি দ্রুত বদলে যাওয়া ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর মানসভূমিটিকে জয় করার চেষ্টা করেছেন। অনেক বিশেষজ্ঞ তাঁর এই পদ্ধতিকে ধ্বংসাত্মক উদ্ভাবন আখ্যা দিয়েছেন। আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক ক্লেটন ক্রিস্টেন বলছেন, চলতি রাজনীতির গৃহীত ছকগুলি ভেঙে সেখানে নতুন মূল্যায়ন চালু করার পদ্ধতি মোদীর একান্ত নিজস্ব।

বাস্তবে যখন তাঁর বিরোধীরা ও তথাকথিত উদারবাদী রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা পুরনো ধারার রাজনৈতিক মডেলে আবদ্ধ রইলেন যার সঙ্গে আজকের দিনের তরুণ ভোটারদের কোনো মানসিক যোগ নেই, মোদী তখন এই প্রাচীন ধাঁচা ভেঙে নবীন নির্বাচকমণ্ডলীকে নতুন কথা শোনাতে চাইলেন। তারা আকৃষ্ট হলো। এক্ষেত্রে তাঁর গরিব চা-ওয়ালা যিনি নিউ দিল্লির সুবিধাভোগী রাজনৈতিক কেষ্টবিষ্টুকে সপাটে আক্রমণ করতে কোনো হীনমন্যতায় ভোগেন না শুধু নয়, নিজের চিন্তা ভাবনাকে তুমুল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করতে সর্বাংশে বিশ্বাসযোগ্য এই বিষয়টি ভীষণ কাজ দিয়েছে। তিনি বার বার বলেছেন, তিনি সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মাননি। সম্পূর্ণ অতর্কিতে কালোটাকা ও দুর্নীতির ওপর মস্ত আঘাত হানতে ঘুণাক্ষরেও টের না পাওয়া এক বিশাল জাতির জনসংখ্যার ওপর রাতারাতি বিমুদ্রীকরণের ধাক্কা বাস্তবিকই এক ধরনের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ছিল। দেশে ও বিদেশে এই সিদ্ধান্তের সম্পর্কে নানান অর্থনীতিবিদ বিরূপ মতামত দিয়েছেন। কিন্তু তিনি জনতার মন ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। বেহিসেবি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা যখন ব্যাঙ্কগুলিতে এসে পাহাড়ের চেহারা নিতে শুরু করল, গরিষ্ঠাংশ গরিব জনতা একে সর্বার্থেই বড়

**নরেন্দ্র মোদী, যিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে সফল হওয়ায় বিশ্বাসী। এমন একজনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর গ্রহণযোগ্য কোনো নেতা, যিনি মোদীকে তাঁর খেলায় তুলমূল্য লড়াই দিতে পারবেন— সেটা কী বিরোধীরা খুঁজে আনতে পারবেন আগামী দু' বছরের মধ্যে? কাজটা হয়তো অসম্ভব।**

লোকের বিরুদ্ধে এক বহু প্রতীক্ষিত অর্থনৈতিক আক্রমণ হিসেবেই দেখল। উত্তরপ্রদেশের ভোটদাতারা মাঝে মাঝে ক্ষোভ ব্যক্ত করলেও আদতে ধনীদের বিরুদ্ধে কিছু না করার চেয়ে তাদের টাকাকে ব্যাঙ্কে ঢোকাতে বাধ্য করাকেই একটা বড় জয় বলে মনে করেছিল।

এখন দেখা যাক উত্তরপ্রদেশের এই জয়ের দু'টি বড় তাৎপর্য কী? প্রথম হচ্ছে একটি ধারণার বিষয় যে কংগ্রেস দলের ক্ষয়িষ্ণু ভাবমূর্তি ও তাদের সমর্থ হারানোর জন্যই বিজেপি ফুলে ফেঁপে উঠছে। কিন্তু যেই মাত্র প্রাদেশিক দলগুলির মোকাবিলায় যাবে তখনই মুখ থুবড়ে পড়বে। দিল্লি ও বিহারের ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটি বেশ খাপ খেয়েছিল। কিন্তু হায়! উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে আর লাগল না। একই সঙ্গে বিজেপি মেপে মেপে ক্ষমতা ভাগ করে খাওয়া দু'টি বিশালাকার প্রাদেশিক শক্তি সমাজবাদী ও বহুজন সমাজবাদী পার্টিকে ধ্বংস করে দিল। আর এই ধ্বংসাত্মক কর্মে তারা শুধু পরাজিতই হলো না, দেশের কাছে সাম্প্রদায়িক ও কেবলমাত্র জাতপাতের রাজনীতি করা দুটি দল হিসেবেও চিহ্নিত হয়ে গেল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে তাদের নির্লজ্জ ভোট ভিক্ষেও অতীতে নির্দিষ্ট স্বজাতির প্রতি নগ্ন পক্ষপাত। চূড়ান্ত মুসলমান ও যাদব ক্ষমতায়ন এই নির্বাচনে এক বিপুল মুসলমান বিরোধী, যাদববিরোধী, জাঠবিরোধী ভোটদাতাদের জন্ম দেয়। তারা মোদীর পথেই বিকল্পের সন্ধান পায়। সমাপ্ত হয় ৯০-এর দশকে জন্ম নেওয়া মণ্ডল রাজনীতির কু-ইতিহাস।

এবার মোদীর দ্বিতীয় পন্থাটি হলো কৌশলে কংগ্রেসের পায়ের তলা থেকে চিরকালীন গরিবের পক্ষে আর ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীর কার্পেটটি সরিয়ে নেওয়া। বিমুদ্রীকরণের জনক হিসেবে গরিবের মসীহা-র ইমেজ তাঁর তৈরিই ছিল আর মস্তিষ্ক চালনায় অপটু কংগ্রেস দল কেবল গালিগালাজ করা ছাড়া বিমুদ্রীকরণের কোনো অ্যান্টিথিসিস খাড়া করতেই পারেনি। ফলে তারা গরিব বিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত বড়লোকের ধামাধরার ছাপ্পা পেয়ে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, এতকাল রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে যে ধর্মনিরপেক্ষতার অসাধারণত্বকে মান্যতা দেওয়া হোত তাও ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। সহজ হিসেবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে উত্তরপ্রদেশে ১৯ শতাংশ মুসলমানের বসবাস হলেও নির্বাচনে বিজেপি তাদের কোনো টিকিট দেয়নি। সঙ্গে বিপুল জয়ের মাধ্যমে এটাও প্রমাণ করে ছেড়েছে মুসলমানদের ছাড়াও তারা নির্বাচন জিততে পারে। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী অন্য কোনো বৃহত্তর পরিসরে বিশ্লেষণ অবশ্যই করতে পারেন।

যাইহোক, এখন একটা জিনিস পরিষ্কার ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের রাস্তায় তাঁর তেমন সিরিয়াস কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আর টিকে নেই। পঞ্জাবে কংগ্রেসের জয় থেকে এই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়ে আসছে। কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহের ব্যক্তিগত ক্যারিশমায়। কংগ্রেস দলের সেখানে কোনো পুনরুত্থান ঘটেনি। রাহুল গান্ধী ছিলেন নীরব দর্শক। একই সঙ্গে এই নির্বাচনে আস্ফালন করা আপদলের ব্যাপক পরাজয়ে যদি বা মোদীর পথে কোনো তথাকথিত ভবিষ্যৎ কাঁটার উৎস হতে পারত তাও উৎপাটিত হয়ে গেল। কেজরিওয়াল এই রাজ্যটি জয় করতে পারলে একটি সর্বভারতীয় অস্তিত্ব প্রমাণ করার সুযোগ ছিল। এরপর কেজরিওয়াল গুজরাটের জন্য হয়তো তোড়জোড় করবেন, সেখানকার বিক্ষুব্ধ পাতিদারদের আরও খেপিয়ে তুলবেন এমনটা ভাবা গিয়েছিল। পঞ্জাবের এই ধাক্কায় তিনি গুটিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে তিনি রাজৌরী গার্ডেন ও দিল্লির করপরেশন নির্বাচনগুলিতেও বিধ্বস্ত হয়েছেন। এর ফলে কেজরিওয়াল এখন অকিঞ্চিৎকর।

অনেকেই বলছেন ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করার পর ক্ষমতার শীর্ষে থেকেই পরাজিত হয়েছিলেন। সমস্ত বিরোধী দল একজোট হয়ে তাঁকে অপসারণে সক্ষম হয়েছিল। তবে কেবলমাত্র একজনের বিরুদ্ধে বাকি সকলের সংখ্যা জুড়লেই ভোটে জেতা হয়ে যাবে এ অতি সরলীকরণ— জটিল ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অচল। বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী যখন নরেন্দ্র মোদী যিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে সফল হওয়ায় বিশ্বাসী। এমন একজনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর গ্রহণযোগ্য কোনো নেতা যিনি মোদীকে তাঁর খেলায় তুলমূল্য লড়াই দিতে পারবেন— তাকে কী বিরোধীরা খুঁজে আনতে পারবে তাও দু' বছরের মধ্যে? কাজটা হয়তো অসম্ভব।

*(লেখিকা প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক)*

## চিঠিপত্র

### পশ্চিমবঙ্গে আশার আলো

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির হাওয়া নেই, নাম-গন্ধ নেই। এক সময় একটু হাওয়া দেখা দিয়েছিল, আজ তা একেবারেই স্তব্ধ। এখানে বিজেপি মাটি পাবে না, এখানে পদ্ম ফুটবে না। সিপিএম নিয়েছে ৩৪ বছর, দিদি নেমে ৩৫ বছর। ততদিনে বিজেপি ভারতবর্ষ থেকেই মুছে যাবে— এটাই এতদিন শুনে এসেছিল বঙ্গবাসী। শুনতে শুনতে বিশ্বাসও হয়েছিল। কিন্তু রামনবমীতে গেরুয়া বাহিনীর শোভাযাত্রা দেখে, আজ বঙ্গবাসী উৎসাহিত, আপ্লুত, আনন্দিত। আশার আলো জ্বলে উঠেছে হৃদয়ে, বিশ্বাস জেগেছে মনে, শক্তি সঞ্চার হচ্ছে বাহুতে। আরে— এতো হাওয়া নয় এতো হাওয়া নয়, এতো ঝড়। এমনকী এই মত আজ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদেরও। এতদিনের বঞ্চনা লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়ে বঙ্গবাসী যে আশার আলো লুকিয়ে রেখেছিল, সেই আলোয় আজ উদ্ভাসিত বঙ্গবাসী, আনন্দে আত্মহারা।

দিদির আগমনে এক সময় বঙ্গবাসীর মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে এবার বোধ হয় মানুষ একটু ন্যায়বিচার পাবে, স্বস্তিতে বাঁচতে পারবে; কিন্তু দিদি সকলকে আশাহত করেছেন, বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। তাই আজ সর্বত্র আমজনতার একটা অভিমত শুনতে পাওয়া যায়— 'এর থেকে সিপিএম ভাল ছিল।' আজ পশ্চিমবঙ্গে দিদির ভাইদের দুটি, তিনটি বা তারও বেশি গোষ্ঠী। তাদের মধ্যে সর্বদাই ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, খুনোখুনি। নেই কোনো আইন-শৃঙ্খলা, কেউ কাউকে মানে না, পুলিশকে মার খেতে হয়, ভয়ে টেবিলের তলায় লুকাতে হয়। কী করে কোথা থেকে টাকা কামানো যাবে, দিনরাত তারই ধান্দা। দিদি রোজগারের অনেকগুলি ফ্রন্ট খুলে দিয়েছেন, তা দেখে ভায়েরা নিজেদের সুযোগ ও সুবিধা মতো আরও অনেক ফ্রন্ট গড়ে তুলেছেন। সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, বালিখাদান, গোরুপাচার ইত্যাদি অসংখ্য রোজগারের রাস্তা খুলেছে পশ্চিমবঙ্গে। এই নিয়ে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে ঝগড়া মারামারি ও খুনোখুনিতে প্রাণ হারাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। বঙ্গবাসী আজ অনুশোচনায় স্বখেদে বিলাপ করছে— একি করলাম আমরা, শেয়াল তাড়িয়ে নেকড়ে নিয়ে এলাম!

এইরকম একটা পরিস্থিতিতে রামনবমীর অনুষ্ঠানে, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত রাস্তায় নেমে আসা, গৈরিক পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রায় শামিল হওয়া। শোভাযাত্রা ঘিরে উৎসাহ উচ্ছ্বাস উদ্দীপনাভরা নৃত্য। শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া মানুষদের প্রতি ফুল ছুঁড়ে, ফোঁটা দিয়ে মা-বোনেদের স্বাগত আশীর্বাদ। তাই দেখে আমজনতা, বিজ্ঞজন, বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করেছেন— এতো হাওয়া নয়, এতো ঝড়।

হ্যাঁ সেরকমই একটা পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে। তাই হালকা, এবড়ো খেবড়ো অবিন্যস্ত বস্তুগুলিকে সুবিন্যস্ত সুসজ্জিত করে, বাঁশ বা রোলার দিয়ে বেঁধে মসৃণ ও ভারী বস্তু দিয়ে চাপা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যে অবিন্যস্ত বিশৃঙ্খল 'যুবসমাজ' তাদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনাটাই এখন সব থেকে বড় কাজ।

—**বিধান চন্দ্র আখুলি,**
বাঁকুড়া।

### সেকুলারদের মোল্লা ভজন

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের উপর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও তার সমমনোভাবাপন্ন সংগঠন সমূহের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারে সেকুলারপন্থী অর্থাৎ যারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়— ধর্মনিরপেক্ষ নামক খোজা সম্প্রদায়ভুক্ত, তাদের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে যে শুভ চেতনা ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটছে, তাকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ এবং হিন্দুদের প্রতি খয়রাতি উপদেশ দানই যেন দিবারাত্রির কাব্য। মুসলমানরা যখন অকারণে হিন্দুদের উপর হামলা করে, তখন এরা অন্ধ-বোবা-কালা সেজে থাকে। আর মুসলমানদের উপর যেন কাক বক উড়তে না পারে তার জন্য ছত্রধর হিসেবে অষ্টপ্রহর প্রহরায় থাকে।

যখন দেশে বিষবৃক্ষ স্বরূপ সেকুলারিজমের বীজ রোপিত হয়নি এবং তার বিষাক্ত রস হিন্দুদের দেহে সংমিশ্রিত হয়নি তখন হিন্দুস্বার্থ ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত হলেই জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি ফুঁসে উঠত। তর্জনে গর্জনে সরকারকে যেমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলত; তেমনি হিন্দু সমাজের দুর্বলতা ও দোষত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে এবং আত্মরক্ষা ও মা-বোনের ইজ্জত রক্ষায় সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য ডাক দিতেও সঙ্কোচবোধ করতো না।

এখন দিনকাল পাল্টেছে। সেকুলারিজমের বিষাক্ত রস বাঙালির দেহে সংমিশ্রিত হয়ে কিছু বাঙালি হিন্দু এখন খোজা সম্প্রদায়ের মধ্যমণি হিসেবে বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে। তার সঙ্গে বাজারি সংবাদপত্রগুলি পাল্লা দিতে শুরু করেছে এই মনে করে যে— আমরাই বা ওদের থেকে কম কিসে। আমরাই সেরা খোজা। তাই হিন্দুদের উপর বা হিন্দু সংগঠনের উপর যখন মুসলমান, খ্রিস্টান বা রাজনৈতিক আক্রমণ হয় তখন খোজা সংবাদপত্রগুলির সাংবাদিকরা মুক ও বধির সেজে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে— ক্যানিং, নদীয়া, কালিয়াচক, কলিগ্রাম, চোপড়া, ধুলাগড়ির ঘটনা ঘটার পরে এরা 'স্পিক্‌টি নট'।

সম্প্রতি রাজ্যের এক মার্কামারা সম্মাননীয় ব্যক্তি বিশ্বত্রাস ইসলামি জেহাদি জঙ্গিদের সঙ্গে আর এস এস-এর মতো প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন সামাজিক সংগঠনকে জেহাদি আখ্যা দিয়ে কলঙ্কিত করেছেন এবং হুমকি দিয়েছেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে। অথচ যখন কোনো আল্লার বান্দা এদেরই কোলে বসে হুমকি দেয়— আমরা যাকে ইচ্ছা হবে তাকে সরকারে বসাবো, যাকে ইচ্ছা হবে তাকে সরকার থেকে ছুড়ে ফেলে দিব। আবার কাউকে পাথর ছুঁড়ে মারা বা কাউকে

মাথা নেড়া করে গায়ে মুখে কালি লাগিয়ে দিলে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনাম ঘোষণা করে তখন এইসব খোজারা তাদের মধ্যে জঙ্গি-জেহাদি মানসিকতার ছাপ খুঁজে পায় না।

পশ্চিমবঙ্গ এখন হুজি, জে এম বি, সিমি, তালিবান, আইসিস জঙ্গিদের 'খালা আম্মা'র বাড়ি সম। এরা নিশ্চিন্তে খালা আম্মার ছত্রছায়ায় থেকে আরামে খাচ্ছে-দাচ্ছে আর হিন্দুদের নিকেশ করার ছক তৈরি করছে। তার সঙ্গে পয়দা করে ফায়দা লুটার নিঃশুল্ক ছাড়পত্রও পাচ্ছে। তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে এ রাজ্যে সভার অনুমতি দেওয়া হয় না, আর এস এসকে জেহাদি আখ্যা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা করার জন্য পুলিশ দিয়ে বালক-বালিকাদের লাঠিপেটা করা হয়।

—**সাতকড়ি শর্মা,**
মালদা।

## সুশীল সমাজের কাছে বিনম্র আবেদন

রামনবমী তিথিতে অস্ত্র হাতে হিন্দুত্ববাদী মানুষজন রাজ্যের বহু স্থানে মিছিল করার জন্য তথাকথিত সুশীল সমাজের আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। এই অস্ত্র সেই অস্ত্র নয়— যে অস্ত্র পররাজ্য গ্রাস, পরধর্ম নাশ, পরনারী ভোগের জন্য ঝলকায়!

এই অস্ত্রের ঝলকানি স্বধর্ম রক্ষা, স্বদেশ রক্ষা, স্বাজাত্য রক্ষার জন্য। আক্রমণ নয়, আক্রান্ত না হওয়ার জন্য এবং আক্রান্ত হলে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এই অস্ত্রের ঝলকানি। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য এই অস্ত্রের ঝলকানি।

একটু ভাবুন তো— এখন যদি ইউপিএ সরকার কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকত এবং বাংলাদেশে থাকত বিএনপি-জামাত ক্ষমতায়। আর খাগড়াগড় কাণ্ডটা যদি প্রকাশ্যে না আসত তাহলে আজকের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা কেমন থাকত?

'ধর্মীয় মেরুকরণ' আপনাদের তৈরি এবং 'অসহিষ্ণুতা' আপনাদের থিম। ভাগ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গটা তৈরি করতে পেরেছিলেন। না হলে, আপনারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারতা, মহানুভবতা নিয়ে এত গলা ফাটাতে পারতেন? মিছিল-মিটিং করতে পারতেন? মনে রাখবেন, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ভারতবর্ষে হিন্দুরা গরিষ্ঠ থাকলেই থাকতে পারে। উলটোটা হলে ভারতবর্ষ পরিণত হতে পারে এক কট্টর তালিবানি রাজত্বে।

পশ্চিমবঙ্গে আজ যে এক ভয়াবহ দেশবিরোধী শক্তি সক্রিয় তা যে কোনো সুস্থ, চিন্তাশীল, সচেতন মানুষমাত্রই জানেন। হিন্দুত্ববাদীরা যদি দেশবিরোধী শক্তিকে সশস্ত্র শোভাযাত্রার দ্বারা কোনো বার্তা দেয়, অন্যায়টা কোথায়?

আপনারা 'ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি'র বিষয়ে বিষোদ্‌গার করেন। জেনে রাখুন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সিংহভাগ জুড়ে ছিল ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ। শিক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের পকেটে মিলত গীতা এবং বিবেকানন্দের বাণী সংবলিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

তথাকথিত সুশীল সমাজের প্রতি আবেদন, তাই আপনারা উস্কানি দিয়ে, প্ররোচনা সৃষ্টি করে, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, সস্তা জনপ্রিয়তা কুড়িয়ে ভারতাত্মাকে আর ব্যথিত করবেন না।

—**রোমিল আচার্য,**
সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

## কংগ্রেসের দেশপ্রেম

ইদানীং যাঁরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং দেশপ্রেমের ঐতিহ্যের ঢাক পেটাচ্ছেন, তাঁদের অবগতির জন্য স্বাধীনতাকামী ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের অন্তিম লগ্নে কংগ্রেসের ভূমিকার কথা স্মরণ করছি।

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সাতদিনের মধ্যে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন— 'আমি এখন কেবল ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবছি না। সেটা হবে, কিন্তু তার কী মূল্য থাকবে যদি ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের পতন হয় অথবা যদি জার্মানির ধ্বংস আর অপমানের মধ্যে দিয়ে তারা জয়লাভ করে?' ("I am not just now thinking of India's deliverance. In will come, but...") –Horijen, 9.9.1939). অপরদিকে চীন সফররত জওহরলাল নেহরু তড়িঘড়ি দেশে ফিরে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে ব্রিটেনের প্রতি শুধু সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি বললেন— 'ব্রিটেনের অসুবিধের থেকে নিজের সুবিধে করে নেওয়াটা আমাদের দৃষ্টিতে সমস্যা সমাধানের পথ হবে না।... আমাদের সহানুভূতি অবশ্যম্ভাবী রূপে থাকবে গণতন্ত্রের পক্ষে... আমি চাই ভারত এই যুদ্ধে তার পূর্ণ ভূমিকা পালন করুক এবং নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে তার সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করুক' ("we do not approach the problem with a view to taking advantage of Britaim's difficulties... I should like India to play her full part and throw all her resouces into the struggle for a new world" –The Statesman, 10 sept., 1939)।

১৯৪০ সালের ২০ মে, পণ্ডিত নেহরু বলেন— 'ব্রিটেন যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যস্ত সেই সময় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের মর্যাদা খর্ব করবে' ("...World be an act derogatory to India's honour")।

একইভাবে গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল— 'ব্রিটেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই না। এটা অহিংসার পথ নয়' ("We do not seek our Independance out of Britain's ruin. That is not the wey of non-violence")।

কংগ্রেসের দুই মহান নেতার একের পর এক ব্রিটিশ-দরদি বিবৃতি বলে দেয়, দেশের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের আদৌ কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

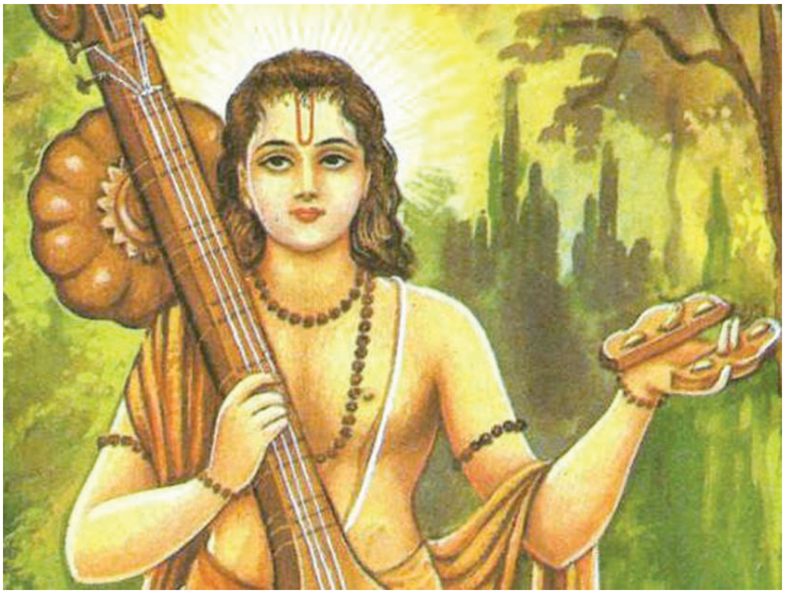

পরম্পরা

# মানব ইতিহাসের প্রথম সাংবাদিক নারদ

রাকেশ দাশ

একাত্ম ভারতীয় সংস্কৃতি ঋষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি। লোককল্যাণকামী ঋষিদের সমুন্নত চিন্তাধারার মূর্ত রূপ এই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির প্রাণশক্তি ভারতের ঋষিকুল, তাঁদের চরিত্র, কৃতিত্ব ও বচনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ। এই শ্রদ্ধাবোধই আমাদের এই সংস্কৃতিকে ইতিহাসাতীত কাল থেকে সেই অখণ্ড জীবনীশক্তি প্রদান করেছে যার দ্বারা এই সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বকে পথনির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

মেকলের শৈক্ষিক আক্রমণের মূল অস্ত্র ছিল ভারতবর্ষের এই ঋষিদের অপদস্থ করা। —'তোমাদের পূর্বপুরুষ রূপে যে ঋষিদের তোমরা পূজা করো তারা অর্ধনগ্ন মূর্খ বনবাসী। অন্য দেশ থেকে এসে এরা এই দেশের ভূমিপুত্রদের নির্মম ভাবে হত্যা করে নিজেরা এই দেশ দখল করে বসে গিয়েছে। তারপর তোমাদেরকেও শোষণ করার জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম চালু করেছে। তোমরা দলিত, পীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত— তোমরা তপশিল জাতিভুক্ত।' বনবন্ধুদের বোঝানো হলো, 'তোমরা এই দেশের আদিবাসী। তোমরাই এই দেশের মালিক। আর্যরা এই দেশে এসে তোমাদের হত্যা করেছে। তোমাদের জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমরা হিন্দু নও। তোমরা পাগান। তোমরা আর্যদের আক্রমণে পীড়িত হয়ে বনে থাকতে থাকতে অসভ্য হয়ে গেছ। তোমরা যীশুর পদতলে এস। তোমরা এই আর্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করো। তোমাদের আমরা অস্ত্র জোগাব'। দাক্ষিণাত্যের মানুষকে বোঝানো হয়েছে, 'তোমাদের নিজেদের সংস্কৃতি তোমরা ভুলে গিয়েছ। তোমরা দ্রাবিড়। আর্যরা তোমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে তোমাদের মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছে।'

ভারতবর্ষের একাত্ম পরিবারভিত্তিক সমাজকে খণ্ড খণ্ড করে তাকে নিজের স্বরূপ ভুলিয়ে তাকে একটি আত্মবিস্মৃত সমাজে পরিণত করা হয়েছে। যে সমাজ কেবল তার ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছে তাই নয়— বরং, সেই সমাজে তার নিজ ইতিহাস ও পরম্পরার বিষয়ে লজ্জা ও ঘৃণার বোধ তৈরি হয়েছে। সমাজ কেবল রাজনৈতিক অধীনতার শিকার হয়েছে তাই নয়, সেই সমাজ বৌদ্ধিক ও বৈচারিক পরাধীনতার শিকার হয়েছে। পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসসুলভ দুর্বলতা ও ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। সেই সমাজ যখন বৈদেশিক রাজনৈতিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে সেই সময় সমাজের সামনে রাষ্ট্রজীবন নির্মাণে যে ধরনের ধারণা তৈরি হওয়া সম্ভব ভারতবর্ষেও সেই ধারণাই তৈরি হয়েছে। নিজ পরম্পরা সম্পর্কে ঘৃণাসম্পন্ন এই সমাজের সামনে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি নতুন আন্দোলন শুরু হলো সাম্যবাদের নামে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভুরা সমাজে যে খণ্ড ভাবনা ও হীনমন্যতা তৈরি করেছিল সেই ভাবনা ও হীনমন্যতাকে কাজে লাগিয়েই রুশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিস্তার শুরু হলো। সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বদলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ঔপনিবেশিক প্রভুদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে সমগ্র রাষ্ট্রকে বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পরাধীন করে রাষ্ট্র দখল ও সমাজ শোষণের নব্য ঔপনিবেশিক চক্রান্ত রচিত হলো। সেই চক্রান্ত সফল করার জন্য বৌদ্ধিক সংগ্রাম শুরু হলো। স্বাধীনতার পূর্বে যে রাষ্ট্রভক্তি সমাজের বৃহত্তর অংশকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ করেছিল সেই রাষ্টভক্তি বর্তমান নব্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তের বিরুদ্ধেও সংগ্রামে মগ্ন হলো। কিন্তু

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের কৌশলও বদলায়। নব্য ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিভূ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহল দেশে বৌদ্ধিক সন্ত্রাসবাদ ও ছায়াযুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলাকৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতবিরোধী, বামপন্থী, ছদ্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষতাকে মানদণ্ড রূপে প্রতিস্থাপিত করে রাষ্ট্রভক্ত চিন্তকদের হেয় প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে শুরু হলো সাম্যবাদী সন্ত্রাসবাদ! ভারতীয় জনমানসে ভারতীয়তাকে ধ্বংস করার যে প্রক্রিয়া মেকলে, মিশনারি, মোল্লা ও ম্যাক্সমুলার রূপী চার ম-কারের মাধ্যমে চলছিল— সেখানে মার্কসবাদ ও মাওবাদকে যোগ করে আক্রমণের পূর্ণতা সম্পাদিত হলো। ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের শ্রদ্ধা ও আস্থার সমস্ত প্রতীক, মানদণ্ড, ভাব, বিচারধারাকে অবমূল্যায়িত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা শুরু হলো। সাহিত্য, কলা প্রভৃতির মাধ্যমে জনমানসে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বিকৃত ধারণা তৈরি করার জঘন্য চক্রান্তের জাল বিস্তৃত হলো। রামচন্দ্রের চরিত্র হনন করা হলো। শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট প্রতিপন্ন করা হলো। মহাভারতের ধর্মযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ রূপে প্রতিপাদন করা হলো। রামায়ণকে অনার্যদের উপর আর্যদের অন্যায় আক্রমণের রূপ দেওয়া হলো। যজ্ঞ ও কর্মকাণ্ডকে নিম্নবর্ণের মানুষদের শোষণের মাধ্যম বলা হলো। বেদ ও উপনিষদকে শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার বলা হলো। গীতাকে স্ত্রী ও শূদ্রদের প্রতি অত্যাচারের মাধ্যম বলা হলো। মা কালীকে ল্যাংটো মহিলা বলে গালি দেওয়া হলো। দুর্গাকে দেহোপজীবিনী লম্পট ও মহিষাসুরকে অনার্য অত্যাচারিত মুক্তিযোদ্ধা রূপে তুলে ধরা হলো।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিকৃত মতবাদে দীক্ষিত করা হয়েছে। তার থেকেও ভয়ানক একটি ঘটনা ঘটেছে। সাধারণ মানুষ— যাদের শ্রদ্ধাশীলতা ও আত্মসম্মান শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ধ্বংস করা যায়নি— তাদের মধ্যেও সাহিত্য ও কলার মাধ্যমে নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা তৈরি করা হয়েছে। তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ দেবর্ষি নারদ।

নারদ চরিত্রকে কীভাবে লোকমানসে প্রচারিত করা হয়েছে? নারদ নামটি শোনামাত্রই আমাদের মনে একজন গলায় মালা পরা বীণাধারী নিষ্কর্মা ব্যক্তির চিত্র ভেসে ওঠে। এই নিষ্কর্মা ব্যক্তিটির কাজই হলো মিথ্যা খবরের মাধ্যমে একের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করে লড়াই বাঁধানো এবং তার মাধ্যমে শ্রেণীশত্রুদের দলিত ও শোষিতদের উপরে বিজয় সম্পাদনের পথ প্রশস্ত করা। সাহিত্যে, ধারাবাহিকে, সিনেমাতে সর্বত্র নারদের এই বিকৃত চরিত্র এমনভাবে প্রচারিত হয়েছে যে সমাজজীবনে নারদ এক প্রকার গালাগালির সমতুল্য শব্দে পর্যবসিত হয়েছে।

কিন্তু যথার্থতা কী? কে এই নারদ? কী কাজ তার? তার অবদান কী তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

নারদ আবাল্য ব্রহ্মচারী, তপস্বী। সৃষ্টির প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার মানস সন্তান। সর্বজ্ঞ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সনৎকুমারের শিষ্য তিনি। চতুর্বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, সমস্ত দর্শন, ধর্মশাস্ত্রে পারঙ্গম। সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ। মহতী নামক বীণা ও করতাল হাতে ভগবানের নামগানে বিভোর নারদ সৃষ্টির সর্বত্র বিচরণ করেন। দেবতাদের মধ্যে তিনি ঋষি। লোককল্যাণ তাঁর জীবনের পবিত্র ব্রত। সমস্ত জাগতিক মায়ার ঊর্ধ্বে তিনি। কিন্তু জগতের সকলের মঙ্গলের জন্য সর্বদা যত্নশীল। অহৈতুকী করুণার সাগর।

এহেন নারদ বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি স্মৃতিও প্রণয়ন করেছেন। ঋণ দান, বন্ধক, বেতনক্রম, ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় সেখানে আলোচিত। নারদ স্মৃতি নামে সেটি পরিচিত। নারদের ভক্তিসূত্রও একটি অদ্ভুত দার্শনিক গ্রন্থ। ভক্তির দার্শনিক তত্ত্বগুলি সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনা গ্রন্থটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। জীবনশৈলী সংক্রান্ত তাঁর বিচারধারা নারদ পাঞ্চরাত্রে সংকলিত হয়েছে। নারদপুরাণ নামক একটি পুরাণে সঙ্গীতশাস্ত্র সমেত বহু নান্দনিক তত্ত্বের সংকলন পাওয়া যায়। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় নারদ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

নারদের সর্বত্র অবাধ বিচরণ। দেবকী ও বসুদেবের প্রথম পুত্রের জন্মের পরে বসুদেব যখন পূর্ব শর্ত অনুযায়ী সেই শিশুপুত্রকে হত্যা করার জন্য কংসের হাতে তুলে দিলেন তখন ক্ষণিক আবেগের বশবর্তী হয়ে কংস বলে যে, বসুদেবের সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হয়ে কংস কেবল দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকেই হত্যা করবে। বাকিদের মুক্তি দেবে। কিন্তু নারদ কংসকে গিয়ে বোঝান যে দেবকীর গর্ভের প্রতিটি সন্তানকেই হত্যা করা উচিত। নারদের এই কাজ খুবই অদ্ভুত। মনে হয় নারদ একজন নৃশংস খুনি প্রকৃতির। আসলে তা নয়। দেবকীর গর্ভের যে সন্তানদের হত্যা করেছে কংস তারা শাপভ্রষ্ট দেবতা। তাদের শাপ ছিল যে, মামার হাতে মৃত্যু হলে তাদের শাপমুক্তি হবে। এই গূঢ় রহস্য জানতেন নারদ। অন্যদিকে কংসের পাপের মাত্রা বাড়িয়ে তোলাও তার আর এক উদ্দেশ্য। পাপিষ্ঠ ব্যক্তির পাপের পরিমাণ পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে পৃথিবীকে তার অত্যাচারে পীড়িত করবে। কংসকে তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা বহুবার পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু কংসের স্বভাবে পাপকর্ম। সে কদাচ পাপ পরিত্যাগ করবে না। তাই নারদ তার পাপের ঘড়া ভরতে চাইছেন। যাতে সে শীঘ্রই নাশপ্রাপ্ত হয়।

সম্ভবত নারদ মানব ইতিহাসের প্রথম সাংবাদিক। লোক কল্যাণ তার লক্ষ্য। তিনি নির্দিষ্ট স্থানে সংবাদকে এমন ভাবে পরিবেশন করেন যাতে মানুষের কল্যাণ হয়। তাঁর এই মহৎ প্রবৃত্তিকে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নিন্দার জন্য কাজে

লাগিয়েছেন।

এর কারণ অবশ্যই আমাদের ঔপনিবেশিক গোলামির মানসিকতা। নারদের চরিত্রকে সার্বিকভাবে কখনও বিচার করার প্রয়োজন বোধ করিনি আমরা। নারদ একজন মহাজ্ঞানী, নির্ভীক, মহাত্মা তপস্বী। নারদ সেই ব্যক্তি যে দুর্ধর্ষ হিরণ্যকশিপুর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার পত্নীকে নিজের শিষ্যা করেছেন। কয়াধুর গর্ভস্থিত শিশুকে সৎ গুণের আকরে পরিণত করেছেন। 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের' নির্মাণ করেছেন নারদ। সম্ভবত জগতের প্রথম সার্জিক্যাল স্ট্রাইক তিনিই করেছেন। প্রহ্লাদের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন হিরণ্যকশিপুর মতো পাপাত্মাকে। পরিত্রাতা হয়েছেন সমস্ত জগতের। শুধু তাই নয়, তাঁর পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী। কিন্তু হিরণ্যকশিপু কেবল একটি ব্যক্তি নয়। সে অত্যাচার, অনাচার ও অন্যায়ের প্রতিভূ। দৈত্যকূলের নেতৃত্ব হিরণ্যকশিপুর স্থানে যাতে একজন নতুন পাপপুরুষের হাতে না যায় তার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন তিনি। তিনি দৈত্যদের দৈত্যসুলভ মানসিকতা থেকে মুক্ত করে প্রহ্লাদের মতো ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাপালক লোককল্যাণকারী নেতৃত্ব উপহার দিয়েছেন।

শিশু ধ্রুব যখন ঈশ্বরের সাধনার যথাযথ পথ দেখতে পাচ্ছে না তখন তাকে পথনির্দেশ করেছেন নারদ। বিশ্বকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও জ্ঞানী উপহার দিয়েছেন তিনি। বেদব্যাসের ন্যায় মহাজ্ঞানী জগদ্গুরুকে পথ দেখিয়েছেন নারদ। মহাভারত, মহাপুরাণ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি রচনা করে, বেদের বিভাজন করে বেদ রক্ষার জন্য চার শিষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যেদিন খিন্নমনে বেদব্যাস নদী তীরে উপবিষ্ট, সেইদিন তাঁকে ভক্তিশাস্ত্রের অনুপম রত্ন ভাগবত পুরাণের রচনার জন্য উদ্দীপিত করেছেন নারদ। বেদব্যাসের ন্যায় মহামতি যাঁকে বিশালবুদ্ধি বলে স্তুতি করা হয় তিনি নারদকে বলেছেন 'অগাধবোধ'— অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার।

যার ভয়ে অরণ্যের পশু-পক্ষী পর্যন্ত সন্ত্রস্ত সেই নৃশংসতম দস্যু রত্নাকরের সন্ধানে অরণ্যের পথে একদিন নারদ চলেছেন। হাতে বীণা ও করতাল। কণ্ঠে মধুর সুরে ঈশ্বরের নামগান। সহসা সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপ রত্নাকর উপস্থিত। হাতে মুক্ত কৃপাণ, রুধিরাক্ত শরীর, রক্তিম নেত্রদ্বয়। নৃশংসতা মিশ্রিত ক্রুদ্ধ স্বরে রত্নাকর বলে উঠল, 'কে তুমি?' তার পরের কাহিনি সকলের জানা। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত নররাক্ষস রত্নাকর মুনির পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। নারদের পূতস্পর্শ জন্ম দিল আদিকবির। জগতের মানুষ পেল বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যিক ইতিহাস রামায়ণ।

নারদ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ধর্মবেত্তা, লোককল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ, মহাত্মা। একাধারে সন্মার্গ প্রদর্শনকারী, সৎগুরু, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন সাংবাদিক। তাঁর চরিত্রের অনুধ্যান আমাদের নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে নব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন প্রেরণা জোগাবে। হিন্দু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যথার্থ দিশা দেখাবে।

*(লেখক : অধ্যাপক, সংস্কৃত অধ্যয়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড়মঠ, হাওড়া)*

# গণিত-কিংবদন্তী রামানুজন

**রূপশ্রী দত্ত**

ভারতবর্ষে ডিসেম্বরের ২২ তারিখটি 'জাতীয় গণিত দিবস' হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ২০১২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী মঞ্চে অনুষ্ঠিত অসামান্য গণিত-প্রতিভা শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্মজয়ন্তীর দিনটিই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনোমোহন সিংহ কর্তৃক 'জাতীয় গণিত দিবস' হিসেবে ঘোষিত হয়।

রামানুজন জন্মেছিলেন ১৮৮৭ সালের ২২ ডিসেম্বর। তিনি লোকান্তরিত হয়েছিলেন ১৯২০ সালের ২৫ এপ্রিল।

দশ বছর বয়স থেকেই রামানুজনের গণিতে দক্ষতা দেখা দেয়। ১৯১৩ সালে তিনি ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৪ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যান। কেম্ব্রিজে প্রথম পাঁচ বছর অনেক 'পেপার' প্রকাশ করেছিলেন ও বেশ কয়েকটি গণিত-সংগঠনের সদস্য হয়েছিলেন। গণিত সংক্রান্ত নানা সংখ্যাতত্ত্বে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। এই দিনটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

রামানুজনের পিতা ছিলেন তামিলনাড়ুর বস্ত্র ব্যবসায়ী। মা গৃহবধূ। কুম্ভকোণমে তাঁর শৈশব কেটেছে। G.H. Hardy নামে এক ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ তাঁকে কেম্ব্রিজে থাকাকালীন অনেক সাহায্য করেন। তখন থেকেই তিনি গণিতজ্ঞ সমাজে আদৃত হতে আরম্ভ করলেন।

রয়্যাল সোসাইটির দ্বিতীয় ভারতীয় সদস্য হিসেবে তিনি নির্বাচিত হন। ট্রিনিটি কলেজের প্রথম ভারতীয় সম্মাননীয় সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর সংখ্যাতত্ত্ব তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। এতদিন পরেও তার সংখ্যাতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট মহলে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। দারিদ্র্য, পরাধীনতা ইত্যাদি কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি। নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে তিনি এক মহান আলোকস্তম্ভের মতো গণিত সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। ভগ্নস্বাস্থ্য, স্বল্প আয়ুর অভিশাপ না থাকলে, তিনি তাঁর কৃতিত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শনের অধিকতর সুযোগ পেতেন এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আরও ব্যাপকভাবে সুবিস্তৃত হয়ে ভারতবাসীকে নবতর গরিমা দান করতেন। গণিতে জীবন উৎসর্গীকৃত এই মহান সত্তার পারিবারিক ব্যাপারে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না। ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে তিনি গাণিতিক পরিমণ্ডলেই চির অক্ষয়, অমর।

# পরিবারের কল্যাণে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

সুতপা বসাক ভড়

প্রকৃতির কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী। একটু অনুভবী মন দিয়ে দেখলে আমরা দেখব যে, কীভাবে প্রকৃতিতেই আমাদের প্রায় সব সমস্যার সমাধান সাজানো আছে। পুজো-পার্বণ বা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অনেক সময় থালা-বাসনের অপ্রতুলতার জন্য আমরা ডিস্‌পোসেবেল থালা-বাটির ব্যবহার করে থাকি; যেমন প্লাস্টিক/ থার্মোকলের থালা-বাটি ইত্যাদি। অতীতের দিকে দৃক্‌পাত করলে দেখতে পাব যে, তখনও আমাদের পূর্বপুরুষরা একই সমস্যার সম্মুখীন হতেন। সেক্ষেত্রে, ওই সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা প্রকৃতির ওপরই নির্ভরশীল থাকতেন। প্রকৃতিও দু'হাত উজাড় করে তাঁদের প্রয়োজনটুকু মেটাত। এখন দৃশ্যটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। আমরা প্রাকৃতিক

জিনিসকে অবহেলা করে কৃত্রিম জিনিস বেশি ব্যবহার করছি। তার ফলও পাচ্ছি। কৃত্রিম জিনিস ব্যবহারে প্রকৃতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে, পরিবেশ-দূষণ হয় এবং ওই দূষিত পরিবেশেই জীবনযাপন করতে আমরা বাধ্য হই। অথচ, আমরা যদি প্রাকৃতিক জিনিসের ব্যবহার বেশি করে করতে অভ্যস্ত হই, তাহলে ওই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ প্রকৃতির যে-কোনো জিনিস ব্যবহারের পরে প্রকৃতিতেই মিশে যায়, কোনো খারাপ প্রভাবও ফেলে না।

যেমন ধরুন, পুজোপার্বণ, উৎসবে পাতায় খাবার চল আমাদের একটি সুন্দর পরম্পরা। কলাপাতা, শালপাতায় খাবার খেলে একটা অন্যরকম স্বাদ পাওয়া যায়। কলাপাতা, শালপাতায় গরম ভাত দিলে সুন্দর একটা গন্ধ ওঠে। কয়েকবছর আগে পর্যন্ত যখন প্লাস্টিক আমাদের জীবনে এতটা ছেয়ে যায়নি, তখন মিষ্টির দোকানে কচুরির তরকারি শালপাতা দিয়ে ঢেকে রাখত। এমনকী সিঙাড়া, কচুরি, জিলিপি ইত্যাদিও শালপাতার ঠোঙা বানিয়ে তার মধ্যে দিত, ওপর থেকেও শালপাতা দিয়ে ঢেকে দিত। শালপাতার কী অপূর্ব একটা সোঁদা গন্ধ থাকত সেই খাবারগুলিতে! অথচ এখন, পলিথিনের প্যাকেটে দেওয়ার ফলে ওই তরকারি থেকে শালপাতার ওই সোঁদা গন্ধটাই হারিয়ে গেছে। কিছু দোকান এখনও শালপাতার বাটিতে খাবার দেওয়ার প্রথাকে ধরে রেখেছে। মন্দিরে প্রসাদে এখনও পর্যন্ত শালপাতার ব্যাপক ব্যবহার চলছে, যা খুবই সন্তোষজনক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর এলাহাবাদে আয়োজিত মাঘমেলাতে শালপাতার বাটি এবং কাগজের প্লেটে প্রসাদবিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমনকী, কৃত্রিম ডিস্পোসেবেল থালা-বাটির ব্যবহার করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন নির্দেশও ছিল। সুতরাং, সুস্বাস্থ্য, ধর্মীয় প্রথা এবং পরিবেশ সবদিক বিচার করলে দেখব যে প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তৈরি থালা-বাটির কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত মহিলারাই বাড়িতে রান্না-খাওয়ার ব্যাপারটা দেখাশুনা করে থাকেন, সেজন্য তাঁরা যদি একটু সচেতনতার সঙ্গে ব্যবস্থাদি করেন, তবে পরিবার এবং পরিবেশ উভয়েরই মঙ্গল হবে।

কিছু বিশেষ গাছের পাতায় খাবার পরিবেশিত হলে, সেই খাদ্যের পুষ্টি অনেকটাই বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশও সুরক্ষিত থাকে। আমাদের দেশে যখন থেকে বুফে পার্টিতে খাওয়ার প্রচলন বেড়েছে, তখন থেকেই পাতায় খাবার খাওয়ার প্রথা প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। অথচ ডাক্তারের মতে ডিস্পোসেবেল থালা-বাটিতে খাবার খেলে ওইসব বাসনে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থ খাবারের সঙ্গে মিশে পাচনক্রিয়াতে কুপ্রভাব ফেলে। ফলে নানারকম অসুখ হতে পারে, যেমন ত্বকের সমস্যা, এমনকী ক্যান্সার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। থার্মোকল বা স্টায়রোফোম দ্বারা তৈরি বাসনে বিস্ফিনোল নামক রাসায়নিক থাকে যা আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষতিসাধন করে।

আমাদের দেশে গাছের পাতায় তৈরি বাসন শুদ্ধ মানা হয়, এগুলি খাবার পরে ধুতে হয় না। ব্যবহারের পরে মাটিতে পুঁতে দিলে জৈবিক খাদ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেসব গাছের পাতা থেকে বাসন তৈরি হয়, সেগুলিতে অনেক গুণ থাকে। বলা হয়, পলাশ পাতার তৈরি বাসনে খাবার খেলে সোনার বাসনে খাওয়ার মতো উপকার পাওয়া যায়, সেইরকম কলাপাতায় খাবার খেলে তা রূপোর বাসনে খাওয়ার ফল দেয়। আয়ুর্বেদে অনেক অসুখের চিকিৎসায় বিশেষ কোনো গাছের পাতার খাবার খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অতীতে ভারতে দু' হাজারের বেশি গাছের পাতার তৈরি বাসনে খাবার খাওয়ার প্রচলন ছিল, যার ফলে মানুষ সুস্থ জীবনযাপন করত। কিন্তু অতি আধুনিকতার দৌড়ে আমরা নিজেদের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছি। প্লাস্টিক ও থার্মোকলের তৈরি থালা-বাটির পরিবর্তে কলাপাতা, শালপাতার বাসনে খাওয়ার প্রচলনকে আমরা এখনও ধরে রাখতে পারি। এই কাজে মহিলারাই সচেতনতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন, কারণ প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা মহিলাদের অনেক বেশি। সেজন্য পরিবার এবং প্রকৃতির কল্যাণার্থে মহিলাদেরই এই ছোট্ট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। ■

## পুস্তক প্রসঙ্গ

# শিশু সাহিত্যের নতুন অধ্যায়

**অম্লানকুসুম ঘোষ**

বাস্তবের কঠোর দিনযাপনের আগে ভোরের নরম আলোয় কল্পনার ভেলা ভাসিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেয় জীবনের প্রভাতকাল অর্থাৎ শৈশব। শৈশবের সেই কল্পলোকের নব নব সৃষ্টির প্রেরণা হয় শিশুসাহিত্য। শিশুমনে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে কিছু কিছু শিশুসাহিত্য হয়ে ওঠে কালজয়ী, অমর। কালের গণ্ডী অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও ভাষার গণ্ডীও

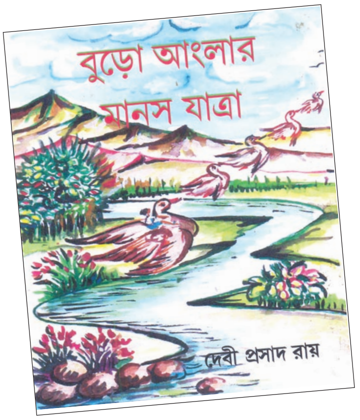


তারা অতিক্রম করে অনায়াসেই। সেরকমই একটি শিশুসাহিত্য হলো 'বুড়ো আংলা'। বিদেশি সাহিত্যের ছায়ায় রচিত অবন ঠাকুরের এই চিরকালীন শিশুমনজয়ী গদ্যসাহিত্যটি শতবর্ষেরও অধিককাল ধরে আনন্দ দিয়েছে, কল্পনার খোরাক দিয়েছে বাংলার শিশুমনকে। সেই 'বুড়ো আংলা'র ছন্দোবদ্ধ রূপ হিসেবে 'বুড়ো আংলার মানসযাত্রা' সৃষ্টি করেছন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান দেবীপ্রসাদ রায়। কল্পজগতের প্রাথমিক শর্ত হিসেবেই শিশুমন সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অসীমের পানে যেতে চায় এবং সেই চাওয়ার অঙ্গ হিসেবেই তারা মাটির পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে ভেসে যেতে চায় মেঘের রাজ্যে, উড়ে

*লেখক দেবী প্রসাদ রায়*

যেতে চায় পাখিদের সঙ্গে পাখিদের মাঝে। এই উড়ে যাওয়া রয়েছে বুড়ো আংলার গোটা পর্ব জুড়েই। তারই অঙ্গ হিসেবে বাংলার সমভূমির অতঃপর তরাই ডুয়ার্স এলাকার এবং অবশেষে হিমালয়ের অসীম উচ্চতার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে লেখাটি জুড়ে। লেখাটির একদম শুরুতে শিশুসাহিত্যের আবশ্যক অংশ হিসেবে জ্ঞাত বিদ্যাসাগরীয় ঘরানার নীতিশিক্ষা (শান্ত হওয়া ভাল, দুষ্টুমি করা খারাপ, দুষ্টুমি করত বলে রিদয় গণেশের অভিশাপে ছোট হয়ে গেছিল) বর্তমান এবং একেবারে শেষে কল্পজগতেরই আরেক পর্যায় স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নের অবসানে গল্পের সমাপ্তি। ছন্দের বন্ধনে পড়েও 'বুড়ো আংলার মানসযাত্রা' মোটেই শিশুমনের কোমলতা থেকে দূরে সরে যায়নি বরং সহজ সরল ভাষা এবং ছড়া উপযোগী ছন্দ তাকে আরও বাঙ্ময় করে তুলেছে। কবিতার চরণগুলি ছোট এবং শব্দচয়ন সহজ হবার কারণে তা শিশুদের কাছে আরও আদরের হবে বলেই মনে হয়। অবন ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' যারা পড়েছে সেই শিশুরা 'বুড়ো আংলার মানসযাত্রা' যখন পড়বে তখন নতুন আস্বাদ পাবে বলেই আশা করা যায়। শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শ্রীরায় শিশুপাঠ্য উপযোগী বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করে শিশুমনে পূর্বেই স্থান করে নিয়েছেন। 'বুড়ো আংলার মানসযাত্রা'-ও শিশু-সহ সবার কাছেই সমানভাবে সমাদৃত হবে। এরকম একটি শিশুসাহিত্য শিশুদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য শ্রীরায় অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

*বুড়ো আংলার মানস যাত্রা :*
*লেখক : দেবীপ্রসাদ রায়।*
*প্রকাশনা : সাহিত্য জগৎ।*
*৫৩/১/১, নীলমণি সরকার স্ট্রিট,*
*কলকাতা-৯০।*
*মূল্য : ৮০ টাকা।*


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

**প্রণব**

পড়ুন ও পড়ান

# রঙ্গোলি সেন্টার
# স্বজনহীন মহিলাদের আশ্রয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** বারোটি ছেলেমেয়ের মধ্যে মাত্র তিনজনকেই বাঁচাতে পেরেছেন চিনাম্মা। তিনজনই মেয়ে বিবাহিত। চিনাম্মা থাকেন ছোটমেয়ের কাছে— বেঙ্গালুরুর রাজেন্দ্রনগরের এক বস্তিতে। এখন মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই জুটলেও চল্লিশ বছর আগে ছবিটা অন্যরকম ছিল। তখন চিনাম্মার দিন কাটত একলা। না ছিল আশ্রয়, না দু'বেলার দু'মুঠো অন্নসংস্থান। জীবনের এই বিবর্ণ চালচিত্রটি বদলে গেল এক অদৃশ্য জাদুকরের স্পর্শে। এখন চিনাম্মা ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠেন। জামাকাপড় বদলে রওনা হন কর্মস্থলে। সেখানে তাঁর বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। চিনাম্মা পৌঁছনোমাত্র শুরু হয় গান। এক-একদিন নাচও। সারাদিন নেচেগেয়ে কাজ করেন সবাই। তৈরি করেন কম্বল, মাদুর, কাগজের ব্যাগ।

রঙ্গোলি সেন্টারে মহিলারা।

যে সংস্থার উদ্যোগে জীবনের প্রান্তবাসী এইসব মহিলার নতুন কর্মপ্রেরণা তার নাম রঙ্গোলি সেন্টার। গত পাঁচ বছর ধরে এই সংস্থা বেঙ্গালুরুর আশেপাশে বিভিন্ন বস্তিতে যেসব স্বজন-পরিবারহীন বৃদ্ধা বাস করেন তাঁদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার পথ দেখিয়ে চলেছে।

কয়েক বছর আগের কথা। এলাকায় এমন অনেক বৃদ্ধা থাকেন যাঁদের থাকার কোনো জায়গা নেই, কেউ কেউ আবার পরিত্যক্তা। তাঁদের স্বজন পরিজন থেকেও নেই। স্থানীয় বিধায়ক এই মহিলাদের জন্য কিছু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একটি ছোট ঘরে জন্ম হয়েছিল রঙ্গোলি বৃদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়। পাশাপাশি রুজি-রোজগারের উৎস। মোটামুটি তাদের দু'ভাগে ভাগ করে দু'রকম কাজ দেওয়া হয়। একদল তৈরি করেন কাগজের ব্যাগ। অন্যদল মেঝেতে পাতার কম্বল ও মাদুর।

প্রতিদিন সকালে মহিলারা কাজে চলে আসেন। রঙ্গোলির কার্যনির্বাহী সঞ্চালক জে. উদয়শ্রী বলেন, আমাদের এখানে দুপুরে কর্মীদের খাবার দেওয়া হয়। এছাড়া আমাদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক তাঁরা বছরে দু'বার জামাকাপড় দিয়ে সহযোগিতা করেন।

রঙ্গোলিতে যা তৈরি হয় সবই বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়। এছাড়া ক্রেতার বিশেষ চাহিদা মতো জিনিস বানিয়ে দেন রঙ্গোলি কর্মীরা। বিক্রি থেকে যা আয় হয় তার প্রায় সবটাই কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। বাকিটা খরচ করা হয় সংস্থার উন্নয়নে। কর্মীদের শুধু এককালীন উপার্জন নয়, ভবিষ্যতের কথাও রঙ্গোলির পরিচালকরা গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন। এখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের প্রত্যেকের নামে পেনসন প্রকল্প রয়েছে। এছাড়া রয়েছে স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ।

রঙ্গোলি এবছর ষষ্ঠ বছরে পা রেখেছে। এটা এমন একটা যখন সারা পৃথিবীর কাছে রঙ্গোলির মহিলা কর্মীদের হাতের কাজ তুলে দরকার। এদেশের বেশিরভাগ সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বিপণনের ক্ষেত্রে মার খায়। রঙ্গোলির কর্ণধার শান্তি যোসেফ বলেন, 'আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা যদি সংগঠন এবং বিপণনে সাহায্য পাই তাহলে আমাদের কাজ একদিন আরও বড়ো বাজার পাবে। ■

**শ্রেয়সী বন্দ্যোপাধ্যায়**

পাঞ্চজন্য শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম। আবার নান্দীকারের সাম্প্রতিক নাটকেরও নাম। নাটকটিতে পাঞ্চজন্যের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণিত হলেও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে একটি বাক্যও খরচ করা হয়নি। তাই এই নামকরণের তাৎপর্য বোধগম্য হলো না।

একটি সফল নাটকের মেরুদণ্ড হলো তার কাহিনি। সেই কাহিনি যদি

মহাভারত নির্ভর হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহ তৈরি হয়। কিন্তু দর্শক আগ্রহের অচিরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে যদি দেখা যায় নাটকটির কাহিনিতে অজ্ঞতা অথবা বিশেষজ্ঞতা-প্রসূত বিকৃতি ঘটেছে। নান্দীকারের নাটক পাঞ্চজন্যের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে নাটকটির আধার শ্রীকৃষ্ণের জীবন। কিন্তু আগাগোড়া বিকৃত এবং অর্ধসত্য তথ্যে ভরপুর। মহাভারতকার লিখেছেন জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন মধ্যম পাণ্ডব ভীম। নাট্যকার দেখিয়েছেন ভীম নয়, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বধ করেছিলেন জরাসন্ধকে। নাটকে যুধিষ্ঠির ক্লীব এবং নপুংশক। বংশপরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা থাকায় তাঁর রাজচক্রবর্তী সম্রাট হওয়াও নাটকে বিতর্কিত বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত। বলা বাহুল্য, এসবের কোনোটির সঙ্গেই প্রকৃত মহাভারতের কোনো সাদৃশ্য নেই। সাহিত্য এবং মহাকাব্যের চরিত্রগুলির একটি সহজাত বিস্তার রয়েছে যা নাট্যকারের যথেচ্ছাচারের সৌজন্যে প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

তথ্যবিকৃতির (এবং ভাববিকৃতি) উদাহরণ আরও আছে। নাটকে গান্ধারী আগাগোড়া দুর্যোধন-সহ তাঁর শতপুত্রের মৃত্যুর জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করে গেলেন। কিন্তু দুর্যোধনের কুকীর্তির কথা একবারও বলা হলো না। অনুল্লিখিত থেকে গেল দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথাও। শ্রীকৃষ্ণের গুরু সন্দীপনী মুনিকে দেখানো হলো ভাঁড় হিসেবে। আমাদের প্রশ্ন, শ্রদ্ধেয় মুনির চরিত্রহনন করে নাটকটির শিল্পোৎকর্ষ বাড়ল কি?

মহাভারতকার লিখেছেন শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করেছিলেন একজন ব্যাধ। অথচ নাটকে প্রৌঢ় কৃষ্ণকে হত্যা করল কিশোর কৃষ্ণ। হয়তো গূঢ় কোনো ব্যঞ্জনা থাকবে কিন্তু সাধারণ দর্শক এই চিত্রকল্পের অর্থ বোঝেননি। সমগ্র নাটকটিতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে অনাবশ্যক অপমান করা হয়েছে। প্রথম অর্ধে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমতালোভী স্বার্থপর এক পুরুষ। কংসের হত্যা থেকে শুরু করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ— সবই তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে ঘটানো। আবার নাটকের শেষ অর্ধে শ্রীকৃষ্ণ জড়দগব। নিয়তির হাতের পুতুল। একদিন যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের নিয়ন্তা ছিলেন তিনি কীভাবে নিয়তির ক্রীড়নকে পরিণত হতে পারেন? বলাবাহুল্য, নাট্যকার এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি। নাটকের শেষে, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর শান্তি ও মঙ্গল কামনায় উচ্চারিত হলো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে...। নাট্যকারকে আমাদের প্রশ্ন, এই শ্লোকের সঙ্গে শান্তি ও মঙ্গলকামনার আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি? এই শ্লোকে তো আত্মার অবিনশ্বরতার কথা বলা হয়েছে। শান্তি ও মঙ্গল কামনাই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় তা হলে 'সর্বেঽপি সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ',— এই শ্লোকের প্রয়োগই যথাযথ হোত। এর অর্থ, 'সবাই সুখী হোক, সবাই রোগমুক্ত হোক। সবার মঙ্গল হোক, কেউ যেন দুঃখভোগ না করে। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক।'

অভিনয়ে সোহিনী সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রাসাদ সেনগুপ্ত এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত— সকলেই মোটামুটি। দাগ কাটতে পারেননি কেউই। সংলাপ অত্যন্ত দুর্বোধ্য। মহাকাব্যিক মেজাজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পোশাক পরিকল্পনাও মাথামুণ্ডুহীন। ভারতীয় সমাজে শোকের প্রতীক সাদা, কালো নয়। অথচ পুত্রশোকে কাতর গান্ধারী কালো পোশাকে অবতীর্ণ হলেন। সব মিলিয়ে পাঞ্চজন্য দেখার অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর হলো না। ■

# মাকড়সা

মাকড়সা দেখতে অনেকটা কাঁকড়ার মতো। তার মুখে ভয়ানক দুটি অস্ত্র; তার দু-একটা ‘চিম্‌টি’ খেলে হয়তো বড় সুবিধে বোধ করবে না। এই দুটোকে মাকড়সার সাঁড়াশি (দাঁত নয়) বলা যেতে পারে। যুদ্ধ শিকারের সময় এগুলো কাজে আসে। মাথায় বড়-বড় দুটো চোখ। তার ‘আশপাশ’ খুঁজলে ছোট-ছোট আরও চার পাঁচটা দেখতে পাবে।

মাকড়সার নাম নিলেই তার জালের কথা মনে পড়ে। জালে দু’ কাজই চলে; বাড়ি করে থাকা হয়, শিকারেরও সুবিধে হয়। মাকড়সার পেটে গোরুর বাঁটের মতো ছোট-ছোট কয়েকটা বাঁট আছে। এই বাঁটের মুখ দিয়ে একরকম আঠা বের হয়। এই আঠা বাতাসে শক্ত হয়ে দড়ির কাজ করে। এই দড়ি দিয়ে জাল তৈরি হয়। এর এক-একটা এত সরু যে চোখে দেখা যায় না, তবুও বড়-বড় মাকড়সা তাতে ঝুলে থাকে। কোনো হতভাগা পোকা একবার যদি মাকড়সার জালে পড়ে, তবে তার বাঁচার সম্ভাবনা কমই থাকে। হুড়োহুড়ি যত বেশি করে, ততই গোলমাল বাড়তে থাকে। শেষে নিরুপায় হয়ে পড়ে। জালওয়ালা এতক্ষণ ভেতর থেকে শান্তভাবে চেয়েছিল। যেই দেখল জোগাড়টা পাকাপাকি হয়েছে, অমনি আস্তে আস্তে কাছে এল। দড়ি সঙ্গেই আছে; চারদিক ভালো ভাবে দেখে যেন কিছুই হয়নি এমন মুখে হতভাগাকে বাঁধতে লাগল। বাঁধা শেষ হলে ভোজন। মাথা ছিঁড়ে শরীরের রস চুষে নেয়, কিছু খায় না। মাঝে মাঝে দু’-একটা বোলতা এসে জালে পড়ে। তখন ইনি মনে করেন, আপদ গেলেই বাঁচি! বোলতা চড়্‌পড়্‌ করে জালের খানিকটা ছিঁড়ে পালায়।

জালের কোনো ভাগ ছিঁড়ে গেলে, যত্ন করে তক্ষুনি তা সারাই করে রাখে। এক জাল অকেজো হলে গেলে আর একটা তৈরি করে। এভাবে দড়ির পুঁজি ফুরিয়ে যায়। তখন প্রতিবেশী কেউ থাকলে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে তার জাল দখল করে। অন্যের জাল কাছে না থাকলে কী করে? গোল্ডস্মিথ সাহেবের মনেও এই প্রশ্ন এসেছিল। তিনি একটা মাকড়সার পেছনে লাগলেন। সে তাঁর থাকবার ঘরেই জাল বুনেছিল। তিনি তার সমস্ত জাল ভেঙে তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সে বারবার জাল গড়তে লাগল, সাহেবও ভেঙে দিতে লাগলেন। একটা পোকার পেটে আর কত দড়ি থাকে। নিরুপায় হয়ে অগত্যা কাছের জাল দেখতে গেল। জালের কর্তা ‘যুদ্ধং দেহি’ বলে প্রচণ্ড লড়াই করল। কিন্তু সাহেবের মাকড়সারই জয় হলো। সাহেব এই দেখে ঘরের সকল জাল ছিঁড়ে দিলেন। এবার বেচারা বড় বিপদে পড়ল। কিন্তু ছোট জন্তু বলে বুদ্ধি কম নয়। সাহেবের কাগজপত্রের মধ্যেই থাকতে লাগল। খিদে পেলে সে জায়গায় মড়ার মতো পড়ে থাকত, কোনো পোকা কাছে এলেই তাকে ধরে ফেলত।

মাকড়া খায় কী? এ কথার উত্তর আমি অতো সহজে দিতে পারছি না। আমি এ পর্যন্ত এমন কিছু দেখিনি, যা পেলে সে খুশি না হয়। জালে যাই পড়ুক না, নড়লে চড়লেই হলো, কী পড়েছে কে খোঁজ নেয়? মশা মাছির ত কথাই নেই, খিদেয় স্বজাতীয় দু’একটা হলেও চলে। শুনেছি ছোট ছোট পাখি ধরে খায়।

সকলের বড় যে মাকড়সা তার নাম ‘টরান্টুলা।’ এই জাতীয় মাকড়সাই নাকি পাখি ধরে খায়। এক সাহেব একবার তিনটি টরান্টুলা জোগাড় করেছিলেন। তিনটিকেই এক খাঁচায় (খাঁচায় থাকবার যোগ্যও বটে, এক-একটা যে বড়!) রাখা হলো। প্রথম প্রথম কয়েকদিন তারা কিছুই খেল না। তারপর কয়েক খণ্ড মাংস চেটে যেন তাদের খিদে বেড়ে গেল। তখন একটা আর দুটোকে ধরে খেয়ে ফেলল। শেষটা এনে সাহেব বিলেতের প্রাণীশালায় উপহার দিলেন। সেখানে তাকে ছোট ছোট ইঁদুর খেতে দেওয়া হোত। প্রথম প্রথম ইঁদুরটির কিছুই ফেলত না, শেষটা যেন টরান্টুলা মশাই বুঝতে পারলেন যে, ইঁদুরের অভাব হবে না। তখন থেকে কেবল মাথাটি খেতে লাগলেন।

গায়ের কাপড় ময়লা হলে আমরা ধোপার কাছে দিই। মাকড়সার ধোপা নেই, কিন্তু সেও একটা খোলস পুরোনো হলে সেটাকে বদলে ফেলে। তোমরা অনেক সময় দেখেছ, মরা মাকড়সা হাত পা কোঁকড়ে জালে ঝুলছে,—সত্যি সত্যি হয়তো সেটা মাকড়সার খোলসমাত্র।

মাকড়সার বড় বুদ্ধি। একটা বাড়ির বারন্দায় একটা মাকড়সা জাল পেতেছিল। বাতাস এলেই জালের নীচের দিকটা উঠে আসত; বেচারার বড় জ্বালাতন হোত। ভেবে চিন্তে সে একখানা ছোট কাঠি টানাটানি করে নিয়ে এল। সেই কাঠিখানা জালে ঝুলিয়ে দিত; তাতে নঙ্গরের কাজ হোত।

মাকড়সারা জালে বড় পোকা পড়লে দড়ি কেটে তার যাবার সহায়তা করে। এক রকম মাকড়সা আছে, তারা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ঘর বাঁধে। ভেতর সার্টিনের মতো মসৃণ ধীরে ধীরে সরু হয়ে গিয়েছে। একটা দরজাও আছে। দরজাটা মুখে এমন সুন্দরভাবে লাগে যে, ভেতর থেকে ঠেলে না দিলে খোলা যায় না। দরজার গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র আছে, তাকে নখ দিয়ে ভেতর থেকে ধরে রাখে। দরজার বাইরের দিকে মাটি মাখিয়ে এমন করে রাখে যে সহসা চেনা যায় না।

**উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী**

*(সংক্ষেপিত)*

## ভারতের পথে পথে

# চিতোরগড়

চিতোরগড় রাজস্থানের একটি শহর। পাহাড়ের ওপর অবস্থিত চিতোরগড় ১৫৬৮ পর্যন্ত মেবার রাজ্যের রাজধানী ছিল। এ বীরভূমি নামে পরিচিত। এখানকার রাজপুত বীরেরা দেশ-ধর্মের রক্ষার জন্য অসিধারা তীর্থে স্নান করে শপথ গ্রহণ করতেন। রাজপুতানীরা সতীত্ব রক্ষার জন্য জৌহরব্রত করে প্রাণ বিসর্জন করেছেন। ঐতিহাসিক বিজয়স্তম্ভ আজও রাজপুতদের বীরত্বকে স্মরণ করায়। এখানকার পদ্মিনীমহল, কালীমাতা মন্দির, সূরযকুণ্ড, গোমুখকুণ্ড, মহাদেব মন্দির, জৌহরস্থল, বিজয়স্তম্ভ, কুম্ভস্বামী মন্দির-সহ অসংখ্য ঐতিহাসিক স্থান দেশবিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

## এসো সংস্কৃত শিখি

**आगच्छतु भो: ! गृहं गच्छाम: ।**

এসো হে! বাড়িতে চলো।

**इदानीं समय: नास्ति।**

এখন সময় নেই।

**श्व: सायं मिलाम किम्?**

আগামীকাল বিকালে দেখা হবে কি?

**अवश्यं तत्रैव आगच्छामि।**

অবশ্যই ওখানেই আসব।

**इदानीं कुत्र उद्योग: ?**

এখন কোথায় চাকুরি করছ?

---

## ভালো কথা

# বকের সাপ ধরা

আমরা কয়েকজন বন্ধু স্কুলে যাওয়ার সময় দেখলাম একটি বক মাছ ভেবে একটি জলঢোঁড়া সাপকে ঠোক্কর মারল। সাপটি সঙ্গে সঙ্গে বকের শরীরটা পেঁচিয়ে ফেলল। জলের মধ্যে বকটি ঝটপট করতে লাগল। আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বকটি করুণচোখে আমাদের দেখতে লাগলো। আমরা দুটো কঞ্চি কুড়িয়ে এনে অনেক কষ্টে বকের গা থেকে সাপটিকে ছাড়ালাম। ছাড়া পেয়ে বকটি উড়ে গিয়ে কাছেই একটি গাছে বসে আমাদের দেখতে লাগলো। এসব করতে একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় স্কুলে প্রার্থনার লাইনে দাঁড়ানো হলো না। বড়দি রেগে গিয়ে দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমরা সত্যি কথা বললাম। বড়দি হেসে আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে ক্লাসে যেতে বললেন।

**দীয়া রায়, অষ্টম শ্রেণী, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি।**

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## ছোটদের কলমে

# পাকা লিচুর ভয়

**জগাই মণ্ডল, সপ্তম শ্রেণী**

লিচু পেকেছে আনন্দ হচ্ছে
মনে লাগছে ভয়
পাকা লিচু খেয়ে আবার
কখন কী যে হয়!
গত বছর লিচু খেয়ে
অসুখ হলো সবার
দু'একজন মারা গেল
থাকলো না কিছু করার।
গাছ ভরতি লিচু এবার
গাছেই আছে পেকে
মা বললো, খা না দুটো
খাবি না খালি পেটে।

*এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও*


উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com


*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

**শব্দরূপ-৮৩৩** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ১ | | ২ | ৩ | ■ | ৪ | |
| ৫ | | ■ | ৬ | | ■ | | ■ |
| ৭ | | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | ৮ | | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ■ | ■ | ১২ | | ■ | |
| | ■ | ১৩ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ১৪ | | | ১৫ | | ■ | ১৬ |
| ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | |

**সূত্র :**

**পাশাপাশি : ১.** নতুন বছরের হিসাবের খাতা, **৪.** নীলকান্ত মণি, **৫.** বায়ু; রোগবিশেষ, **৬.** বলয়াকার পায়ের গহনা; বিষ্ঠা, **৭.** 'এতটুকু— করেছিনু আশা' (রবীন্দ্রনাথ), **৮.** ঘোমটা, **১১.** সরিষায় শ্রীরাধিকা, **১২.** বিষ্ণুর প্রথম অবতার, **১৪.** লাভের বা পারিশ্রমিকের তুলনায় অতিরিক্ত খাটুনি।

**উপর-নীচ : ১.** ম্যাজিকে লাগে, চুরিতেও, **২.** লেফাফা, **৩.** ভাদ্র মাসের শুক্লানবমী যে তিথিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে তালফল দান ঘটিত ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, **৪.** শিব; পক্ষীবিশেষ, **৫.** জনক, **৯.** চট, চটের থলি, **১০.** শিবের অনুচর, **১১.** রাজপুত রাজার উপাধি ('চিতোরের —'), **১৩.** বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত একপ্রকার সাংগীতিক উৎসব, **১৫.** পল্লী, পাড়া ('কুমোর —'), **১৬.** বৈষ্ণবের তুলসীমালা।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৮৩০**
**সঠিক উত্তরদাতা**

**সঞ্জয় পাল**
**সাহাপুর, মালদা**
**হারাধন চক্রবর্তী**
**পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | অ | কা | ল | বো | ধ | ন |
| ত্রি | শ | ঙ্কু | ■ | ■ | ■ | নু | ■ |
| ধা | ■ | শ | ল্ল | কী | ■ | ষ্ট | ■ |
| রা | কা | ■ | ■ | র | ■ | স্কা | ■ |
| ■ | ড়া | ■ | ব | ■ | ■ | র | বে |
| ■ | না | ■ | সু | দা | ম | ■ | তা |
| ■ | কা | ■ | ■ | ■ | ন | কু | ল |
| বি | ড়া | ল | ত | প | স্বী | ■ | ■ |

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।*
*খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

৮৩৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ মে ২০১৭ সংখ্যায়

# লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

## ।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৩১

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

## যুগধর্ম মেনে মনুস্মৃতি সংস্কারের পরিকল্পনা সংস্কার ভারতীর

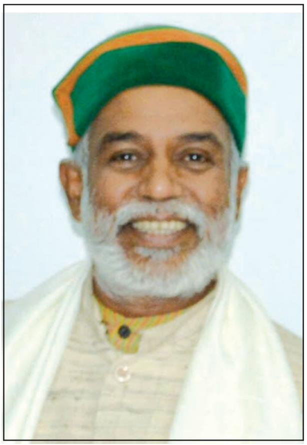

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ভারতীয় পরম্পরা ও ঐতিহ্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত সংগঠন সংস্কার ভারতী কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে যেসব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে তাদের প্রথম লক্ষ্য মনুস্মৃতি। সাধারণ মানুষের একাংশের বদ্ধমূল ধারণা মনুস্মৃতি জনজাতি ও নারীবিরোধী। সংস্কার ভারতী এই ভুল ধারণা ভাঙতে চায়। সংস্থার সাংগঠনিক সচিব আমির চাঁদ বলেছেন, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে যেসব শাশ্বত মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে আধুনিক ভারতীয়দের তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। নাটক সিনেমা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থসমূহের সদর্থক দিকগুলি তুলে ধরা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মনুস্মৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একথা ঠিক মনুস্মৃতিতে এমন কিছু অংশ রয়েছে যা আধুনিক যুগের সঙ্গে মানানসই নয়। সেগুলো বর্জন করা যেতে পারে। আমরা মনুস্মৃতিকে আধুনিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চাই।' মনুস্মৃতির তথাকথিত নারী বিরোধিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অনেকেই জানেন না ঋগ্বেদের ৪৭টি স্তোত্র মহিলারা রচনা করেন। সুতরাং বেদ কীভাবে নারীবিদ্বেষী হতে পারে? প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে আমাদের অপরিসীম অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী।'

## আধার কার্ডের স্বীকৃতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** তপশিলি জনজাতি এবং উপজাতিদের শংসাপত্র দেবার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আধার কার্ডকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে স্বীকৃতি দিল। সেইসঙ্গে আধার কার্ডকে বাসস্থানের প্রমাণ এবং পরিচয়পত্র হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তপশিলি জনজাতি ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, এরপর থেকে আধার কার্ড বাসস্থান ও পরিচয়ের বৈধ প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত হবে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই আধারকে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিরোধিতা করছিলেন। উপায়ান্তর না পেয়ে মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

## মোদী সরকারের তিন বছর

সামনেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তি। এই তিন বছরে সরকারের বর্ণময় পরিক্রমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশিত হবে স্বস্তিকার আগামী ৫ জুন বিশেষ সংখ্যায়। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকেরা।

## নবগ্রহ কুয়ো

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** বিহারের বৈশালী জেলায় বিগত ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষের কাছে একটি আশ্চর্য কুয়ো তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সঙ্গমের কাছেই কবির মঠে এই কুয়োর জলের স্বাদ বিভিন্ন রকমের। ৯টি বিভিন্ন সময়ে ৯টি স্বাদের। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এই কুয়োর জল পান করলে গ্রহদোষ কেটে যায়। মানুষ তাই এই কুয়োকে নাম দিয়েছেন নবগ্রহ কুয়ো। যারা গণ্ডক নদীতে পুণ্য স্নানে আসেন, তারা এই নবগ্রহ কুয়োয় গ্রহশান্তির জন্য একবার স্নান করবেনই। এই কুয়োটি তৈরি হয়েছিল ১৬৪০ সালে। কুয়োর জলের স্বাদ কেন ৯ রকমের তা নিয়ে বিজ্ঞানী ও গবেষকরা বিস্মিত। তবে সবার মতেই প্রাচীন রসায়ন বিজ্ঞানের এ এক চমৎকারিত্ব।

## নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতের জবাবে পাকিস্তানের উদ্বেগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** সম্প্রতি দু'জন ভারতীয় সৈনিকের মুণ্ডচ্ছেদ করে পাকিস্তান চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে। কয়েকদিন ধরে ভারতীয় সেনা জম্মু ও কাশ্মীরের নশেরা সেক্টরে তার জবাব দিতে শুরু করেছে। সেনা সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী ভারতের বিধ্বংসী জবাবে পাকিস্তান যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তাদের আতঙ্কিত হয়ে ওঠার বেশ কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। গত ১৩ মে পাক সেনার ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্‌স (আই এস পি আর) একটি সরকারি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ভারতীয় সেনা যদি মনে করে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে আক্রমণ করবে তাহলে তারা ভুল করবে।'

এই বিবৃতির কিছুদিন পর পাক সেনাপ্রধান বাজওয়া নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর নিকিয়াল সেক্টর পরিদর্শনে যান। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, ভারতীয় সেনার গোলার আঘাতে নিকিয়ালই সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
22 May - 2017 - Rs. 10.00,

With Best
Compliments from

A
Well
Wisher

S.B.

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।